টিপাইমুখ বাঁধ
ও
বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

জাহিদুল ইসলাম

টিপাইমুখ বাঁধ ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

জাহিদুল ইসলাম

প্রকাশায়তন © ২০০৯
www.prakashayatan.com

টিপাইমুখ বাঁধ ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
সচলায়তন ব্লগে প্রকাশিত লেখার সংকলন

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০০৯

মুদ্রণ © লেখক
আন্তর্জাল © প্রকাশায়তন

এই গ্রন্থের স্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত। গ্রন্থটির ইলেকট্রনিক সংস্করণ প্রকাশনার অধিকার প্রকাশায়তন সংরক্ষণ করে। লেখক ও প্রকাশায়তন কর্তৃপক্ষের লিখিত যৌথ অনুমতি ব্যতিরেকে এর সম্পূর্ণ বা আংশিক কপি/পুনঃপ্রকাশ নিষিদ্ধ।

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র | জুবায়ের লোদী
প্রচ্ছদ | মাহবুব আজাদ

www.sachalayatan.com
www.prakashayatan.com
contact@prakashayatan.com

Tipaimukh Dam and Bangladesh
© Zahidul Islam
September 2009

মুখবন্ধ

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় আমাদের সামনে আসলেই দেখা যায় মতামত এবং ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা বহুধা-বিভক্ত হয়ে পড়ি, এবং সবাই নিজের মতামত অন্যদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি। অথচ যেসকল বিষয়ের সাথে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য জড়িত সেসকল বিষয়ে পূর্বজ্ঞান থাকা, মতামত প্রদানকালে নিরপেক্ষ থাকা, সর্বোপরি নিজের ভাবনাতে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ থাকা জরুরী। সাম্প্রতিককালে বহুল আলোচিত "টিপাইমুখ বাঁধ" এমনই একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানে কোনো প্রকার মতামত দেবার পূর্বে বিষয়টি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিষয়টির সাথে নদী, জলপ্রবাহ, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ, পুনর্বাসন, কৃষি, শক্তি উৎপাদন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, কৌশলগত বিষয়, সর্বোপরি স্থানীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতি জড়িত থাকায় বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করেছে। বিষয়টি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমাদের সকলেরই এই বিষয়ে ন্যূনতম জানাশোনা থাকা উচিত যাতে এই ব্যাপারে জাতীয় বিতর্ক উপস্থিত হলে অথবা সরকার সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তাতে আমরা আমাদের যথাযথ মতামত রাখতে পারি। একই সাথে সরকার বা সরকারের নীতির বিরোধিতাকারী পক্ষদের ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল প্রচারণার ব্যাপারেও আমরা সতর্ক হতে পারি।

টিপাইমুখ বাঁধ ও তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রকল্প যেমন, ফুলেরতল ব্যারাজ, সেচ খাল ইত্যাদি প্রকল্পের সবগুলোই আমাদের শক্তিশালী প্রতিবেশী ভারতের উদ্যোগ বলে এই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও তার জনগণকে কৌশলী পদক্ষেপ নিতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বার্থের সপক্ষে জনমত গঠন করার জন্য দেশে ও দেশের বাইরে বসবাসকারী বাংলাদেশের সকল নাগরিককেই এগিয়ে আসতে হবে। টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভ্রান্ত প্রচারণা বা বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী যেকোন চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। বিষয়টি শুধুমাত্র বাংলাদেশের সমস্যা নয় বলে, এবং ভবিষ্যতে একই ধরণের আরও সমস্যা উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে বলে এই ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে এখনই। এই ব্যাপারে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সভা-সেমিনারে বিভিন্ন বক্তা যেসকল বক্তব্য রাখছেন তাতে দেশের সাধারণ জনগণ অনেকটাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এর কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বক্তা বা লেখকের বক্তব্য বিষয়টির কোন বিশেষ একটি দিককে নিয়ে করা অথবা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে করা। এই ধরনের বক্তব্যগুলো থেকে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন ও বাংলাদেশের স্বার্থ কীভাবে রক্ষিত হবে তা বের করা একজন সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। তদুপরি এতদসংশ্লিষ্ট জটিল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়গুলোর সহজ ও সর্বজনবোধ্য ব্যাখ্যারও প্রয়োজন আছে।

এই সমস্যার উপর আলোকপাত করার জন্য এগিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের তরুণ পানিসম্পদ কৌশল বিশেষজ্ঞ জাহিদুল ইসলাম। জনপ্রিয় বাংলা ব্লগ **সচলায়তন**-এ ধারাবাহিকভাবে তিনি সাধারণের বোধগম্য করে ব্যাখ্যা করেছেন টিপাইমুখ বাঁধ সংশ্লিষ্ট জটিল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়গুলো, বর্ণনা করেছেন এর খুঁটিনাটি দিক আর প্রভাবগুলো, ব্যাখ্যা করেছেন সাম্প্রতিককালে এই বিষয়ে করা দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মতামত। এই বইটি তাঁর সেই ধারাবাহিক

রচনার সম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ সংকলন। বইটি পাঠকালে একজন সাধারণ পাঠক টিপাইমুখ বাঁধ বিষয়ে যথাযথ ধারণা পাবেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত থেকে বিষয়টিকে দেখা, বাংলাদেশের স্বার্থের বিষয়টিকে ঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা, এবং এই ব্যাপারে অহেতুক কাউকে দোষারোপ না করার দুরূহ কাজটি জাহিদুল ইসলাম দক্ষতার সাথে করেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ পাঠকদের আগ্রহে আর সচলায়তনের উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে এই বইটির ইলেকট্রনিক সংস্করণ প্রকাশিত হল। ধারাবাহিক রচনা প্রকাশকালে যেসকল পাঠক নানা বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব মতামত প্রদান করেছেন, প্রশ্ন করেছেন তার দরকারী অনেকগুলোই সম্পাদিত এই সংকলন মূল আলোচনায় চলে এসেছে। তবে ঘটনাপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি বিবেচনায় ও পাঠকদের প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে এই বইটির আরও বর্ধিত ও বিস্তারিত সংস্করণ আসতে পারে। জাতীয় স্বার্থে ভেদাভেদহীন অভিন্ন মতামত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং এই ব্যাপারে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করতে এই ক্ষুদ্রায়তন বইটি বৃহৎ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে বিশ্বাস রাখি।

জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আরিফ
ঢাকা, অগাস্ট ২৫, ২০০৯

প্রকাশকের কথা

বাংলা গ্রন্থপ্রকাশের জগতে নতুন ধারার সূচনা করেছে প্রকাশায়তন। সময়ের সাথে বাংলাভাষী মানুষ বঙ্গোপসাগরের সংলগ্নতা পরিত্যাগ করে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বে। দেশে মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ তাঁদের হাতে পৌঁছে দেয়া একটি দুরূহ দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ তাঁদের পাঠপিপাসায় ঘাটতি অনুভূত হচ্ছে না, বরং দূরত্বের কারণে বাংলা বইয়ের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বজোড়া পাঠকের কাছে বই পৌঁছে দেবার প্রয়াস পেয়েছে প্রকাশায়তন; প্রযুক্তির ঊর্ধ্বশ্বাস গতির সাথে সমলয়ে বিদ্যমান তাই প্রকাশায়তনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে অনলাইন প্রকাশনা ব্যবস্থা, প্রকাশিত হচ্ছে বইয়ের ইলেকট্রনিক সংস্করণ, যা নিমেষেই পৌঁছে যাবে বাংলাভাষী বলয়ের কাছে।

জাহিদুল ইসলামের “টিপাইমুখ বাঁধ ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট” গ্রন্থটি প্রকাশায়তনের যাত্রায় প্রথম পদক্ষেপ। নেটজগতের পাঠকের প্রতি আমন্ত্রণ রইলো বইটি পাঠের।

ধন্যবাদ।

প্রকাশনা পর্ষদ, প্রকাশায়তন
অগাস্ট ২৮, ২০০৯
contact@prakashayatan.com

সূচিপত্র

মুখবন্ধ--- ৩
প্রকাশকের কথা--- ৬
সূচিপত্র --- ৭
ভূমিকা-- ৯
১ জলবিদ্যুৎ বাঁধ ও ব্যারেজ--১২
জলবিদ্যুৎ বাঁধ ও ব্যারেজের কারিগরী দিক------------------------------১৩
২ টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প ও এর ইতিহাস -----------------------------১৮
নির্মাণাধীন টিপাইমুখ বাঁধের সাধারণ তথ্যাবলি---------------------------২০
বাঁধ নির্মাণে ভারতের উৎসাহের পেছনে কিছু কারণ----------------------২১
৩ বাঁধের উজান ও ভাটিতে সম্ভাব্য প্রভাব-------------------------- ২৩
বাঁধের উজানে প্রভাব---২৪
বাঁধের ভাটিতে প্রভাব --২৫
উজান ও ভাটির উপর সাধারণ প্রভাব ----------------------------------- ২৮
৪ বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাব ------------------------------ ৩০
কী ধরনের গবেষণা প্রয়োজন --- ৩০
টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে এখনও পর্যন্ত স্বীকৃত গবেষণার উৎস -------------- ৩২
FAP-6 রিপোর্ট অনুসারে টিপাইমুখ বাঁধের বাংলাদেশে প্রভাব----------- ৩২
জলাধার পূরণের সময়কার প্রভাব -------------------------------------৩৪
বর্ষা মৌসুমে প্রভাব ---৩৪
শুষ্ক মৌসুমে প্রভাব ---৩৫
বাঁধ ভাঙার প্রভাব ---৩৫
IWM-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাব ------৩৫
হাইড্রোলজির উপর প্রভাব --৩৬
নদী ও হাওড়ের বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব------------------------------৩৭
মরফোলজির (নদীর গভীরতা ও গতিপথ) উপর প্রভাব --------------৩৭
ভারতের EIA রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে টিপাইমুখের প্রভাব--------- ৩৭
৫ সমন্বিত বিশ্লেষণ--- ৩৯

বর্ষাকালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ফলে বন্যার প্রকোপ হ্রাস কতটা যুক্তিযুক্ত ও ইতিবাচক--- ৩৯
বন্যা কি সত্যিই কমবে-- ৪০
সিলেট ও মৌলভীবাজারের কথিত বন্যামুক্তি কতটা ইতিবাচক-------- ৪১
শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ বৃদ্ধি কতটা ইতিবাচক ও কতটা নেতিবাচক--------- ৪৩
অতি-শুষ্ক মৌসুমে কী হবে---৪৪
অতি-বর্ষা মৌসুমে কী হবে -- ৪৬
ভূমিকম্পে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু--------------------------৪৭
বাঁধ ভেঙে যাওয়ার প্রভাব --৪৭
অপ্রাকৃতিক পরিস্থিতি -- ৪৮
ফুলেরতলের ব্যারেজ হলে কী হবে -------------------------------------- ৪৮
কিছু সঙ্কট পরিস্থিতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন ---------------------৪৯
জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে উজানের প্রবাহ কীরূপ বা কতটুকু পরিবর্তিত হবে ---৪৯
টিপাইমুখ প্রকল্পের ইতিবাচক বনাম নেতিবাচক দিক ------------------ ৫০
৬ এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় --৫২
যাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ--৫২
সরকারের সাম্প্রতিক ভূমিকা--- ৫৩
ভারতের সাম্প্রতিক ভূমিকা --৫৭
এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কী করণীয় ------------------------------------ ৫৮
আইনগত কী কী দিক বাংলাদেশের হাতে আছে--------------------------৬১
৭ পরিশিষ্ট-- ৬৩
তথ্যসূত্র--- ৬৫

ভূমিকা

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, আর মেঘনা নদী বিধৌত বাংলাদেশে রয়েছে ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদী, যার অধিকাংশই এসেছে ভারত থেকে। বাংলাদেশে সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল নদীকে কেন্দ্র করেই। নদীকে ঘিরেই তাই আমাদের জীবন, জীবিকা, ও সংস্কৃতি। নদীর প্রবাহ কোনো রাজনৈতিক সীমারেখাকে মেনে চলে না বলে এর উপর উজান-ভাটি নির্বিশেষে সবার অধিকার সমান। নিজের জীবদ্দশায় গঙ্গা নদী থেকে ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে ভারতের একচেটিয়া পানি অপসারণ ও বাংলাদেশে এর ক্ষতিকর প্রভাব অনুধাবন করেছি। পানিসম্পদ কৌশলের ছাত্র ও গবেষক হওয়াতে এই সমস্যাগুলোকে বেদনার সাথে পর্যবেক্ষণ করেছি প্রতিনিয়ত।

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের অংশ হিসেবে ভারত যখন বাংলাদেশের উজানে বরাক নদীতে টিপাইমুখ সংলগ্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণের সব প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে, তখন বাংলাদেশের আপামর জনগণ এগিয়ে এসেছে এই বাঁধের বিরোধিতায়, শুরু হয়েছে কূটনৈতিক ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বিতর্ক। এই বিতর্ক কি শুধুমাত্র বিরোধিতার খাতিরে, নাকি এর পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশগত ভিত্তি, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই বিষয়টি নিয়ে তথ্য যোগাড়ে নেমেছিলাম। জনপ্রিয় অনলাইন লেখক সমাবেশ **সচলায়তন**-এ নিয়মিত লেখালেখি করার সুবাদে সাধারণ পাঠকদের কাছ থেকেও দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি নিয়ে লিখবার অনুরোধ এসেছে। টিপাইমুখ নিয়ে সাম্প্রতিককালে অসংখ্য লেখার ভিড়ে চেয়েছিলাম

একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা তৈরি করতে। লেখাটি যেন সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজবোধ্য হয়, সে প্রচেষ্টাও ছিল। বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাব নিয়ে সচলায়তনে সাত পর্বের সিরিজটি শেষ করার পর এটিকে একটি বইয়ের রূপ দেওয়ার অভিপ্রায়েই আজকের এই প্রচেষ্টা।

পাঠকদের সুবিধার্থে এই বইটি মোট ছয়টি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে। সাধারণ পাঠকেরা প্রায়শই বাঁধ ও ব্যারেজকে এক মনে করে থাকেন, এবং সে-কারণেই ফারাক্কা ব্যারেজকে আমরা ফারাক্কা বাঁধ মনে করে এর সাথে টিপাইমুখ বাঁধের সাদৃশ্য খুঁজে থাকি। *জলবিদ্যুৎ বাঁধ ও ব্যারেজ* শীর্ষক প্রথম পরিচ্ছেদে তাই পানিপ্রকৌশলগত দিক থেকে এই ধারণাগুলিকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে যে-বিতর্ক সাম্প্রতিক কালে তীব্র হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে অনেক দিনের ইতিহাস। পঞ্চাশের দশক থেকে এই প্রকল্পের আলোচনা থেকে শুরু করে এর পেছনে ভারতের উৎসাহের কিছু তথ্যের সমাহার ঘটেছে *টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প ও এর ইতিহাস* পরিচ্ছেদে।

যেকোন বাঁধই পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। এই প্রভাব উজান ও ভাটি দুই অঞ্চলেই পরিলক্ষিত হয়। *বাঁধের উজান ও ভাটিতে সম্ভাব্য প্রভাব* পরিচ্ছেদে এই প্রভাব নিয়েই মূলত আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাহায্য নেয়া হয়েছে দেশে বিদেশে সম্পন্ন কিছু স্বীকৃত গবেষণা রিপোর্টের।

উল্লেখকৃত রিপোর্টগুলোর আলোকে ও বাংলাদেশের পানি বিশেষজ্ঞদের নিজস্ব মতামতের উপর ভিত্তিকরে টিপাইমুখ বাঁধের বাংলাদেশের প্রভাবের উপর একটি সামগ্রিক আলোচনা উঠে এসেছে *সমন্বিত বিশ্লেষণ* পরিচ্ছেদে।

টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সুবাদে বিভিন্ন মহল থেকে এটির পক্ষে-বিপক্ষে নানাবিধ

কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের এখন কী করা উচিত, সে-সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা উঠে এসেছে *এই মূহুর্তে করণীয়* শীর্ষক পরিচ্ছেদে।

পরিশেষে শত নেতিবাচক প্রভাবের পরও এই প্রকল্পের আদৌ কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা, সে প্রশ্নকে সামনে রেখে বইটির *পরিশিষ্ট* পরিচ্ছেদটি লেখা হয়েছে।

সচলায়তনে লেখার পূর্বে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই আসে দিগন্ত সরকারের নাম। ব্লগ থেকে বইয়ে রূপান্তরের প্রাথমিক ধারণাটি আসে অগ্রজপ্রতিম জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আরিফের কাছ থেকে। সেই সাথে সচলায়তন কর্তৃপক্ষের **প্রকাশায়তন** প্রকল্পের সূচনা এই স্বপ্নটিকে আরও সামনে নিয়ে যায়। সমগ্র সিরিজটিকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসার জন্যে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য, তাঁরা হলেন ইশতিয়াক রউফ, মাহবুব আজাদ ও মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। বইটি প্রকাশের পূর্বে এর সম্পাদনা করে একে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ পাবেন শোহেইল মতাহির চৌধুরী ও মির্জা মোঃ মোজাদ্দিদ বিল্লাহ।

পরিশেষে সচলায়তনের অগণিত লেখক ও পাঠকের প্রতি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইলো, ব্লগে সিরিজটি চলার সময় থেকে এই বইটির প্রকাশের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও পরামর্শের জন্য।

জাহিদুল ইসলাম
ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টা, কানাডা
অগাস্ট ২৭, ২০০৯

www.prakashayatan.com

১ জলবিদ্যুৎ বাঁধ ও ব্যারেজ

পানির অবাধ শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানোর ইতিহাস অনেক পুরনো। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে জর্ডানে প্রথম বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগের কথা জানা যায়। মাত্র ৯ মিটার উঁচু আর ১ মিটার চওড়া সেই বাঁধের মধ্য দিয়ে [১] পানিকে আটকে শক্তি সঞ্চয়ের যে ইতিহাস শুরু হয়েছিল তা আজও অব্যাহত আছে। একসময় আমরা শক্তি নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলাম, আর আজ তার সাথে যুক্ত হয়েছে পরিবেশ। পৃথিবীকে আরও বেশি দিন মানুষ এবং অন্যান্য জীবের বাসযোগ্য করে রাখার জন্য প্রয়োজন সব ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ও দেশের মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা। যেকোনো বাঁধই পরিবেশের ওপর ফেলে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া, এই চরম সত্যটি বুঝতে পানি- বা পরিবেশ-বিশেষজ্ঞ হবার কোনো প্রয়োজন নেই।

ভারতের টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনার কারণে বাংলাদেশ আজ সম্ভাব্য ভয়াবহতার মুখে পতিত। বিষয়টির কারিগরী ও পরিবেশগত দিক স্পষ্টভাবে বুঝতে ব্যর্থতার কারণে তথ্যবহুল চিন্তা ও আলোচনার পরিবর্তে রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে অবিরাম। বিষয়টি নিয়ে ব্লগ, সংবাদপত্র, টিভি, ও জনসভায় আলোচনা হচ্ছে, কূটনৈতিক পর্যায়ে মতানৈক্য চলছে। এই আলোচনাপ্রবাহ সঠিক পথে

প্রবাহিত করতে জলবিদ্যুৎ ও বাঁধ নিয়ে কিছু সাধারণ জ্ঞান প্রয়োজন। অন্যথায় সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার দরিদ্র কৃষকটি যার সারা বছরের খাবার আর জীবন যাপনের একমাত্র অবলম্বন বোরো ধান, কিংবা দরিদ্র জেলেটি যার খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকা নির্ভর করছে বর্ষাকালের হাওড়ের মাছের ওপর, তাঁরা এই আলোচনা থেকে কোনো সুফল পাবেন না।

১৯৭৪-৭৫ সালে ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পর ভারতের একচেটিয়া পানি উত্তোলনকে কেন্দ্র করে একটি চুক্তি করতে কূটনৈতিক আলোচনা গড়িয়েছে ২০ বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ে আমরা নদীর নাব্যতাহ্রাস, লবণাক্ততা ইত্যাদি নানা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। এই অতীত থেকেও আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারিনি। আজ ভারত টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ করার সব প্রস্তুতি যখন নিয়ে ফেলেছে ঠিক সেই মূহুর্তেও আমরা বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতে পারছি না, জাতি হিসেবে একতাবদ্ধ হওয়া তো আরও দূরের কথা।

পদ্মার নাব্যতা হারানোর পর আজ টিপাইমুখ বাঁধ ও সেই সাথে ফুলেরতল ব্যারেজ নির্মিত হলে মেঘনা নদীর নাব্যতাও ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। বাকি থাকবে শুধু ব্রহ্মপুত্র (যমুনা), যার অপমৃত্যু ঘটবে যদি ভবিষ্যতে ভারতের উচ্চাভিলাষী নদীসংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

জলবিদ্যুৎ বাঁধ ও ব্যারেজের কারিগরী দিক

মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে পানি প্রকৌশলগত কিছু বিষয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ আমরা অনেক সময়ই বাঁধ ও ব্যারেজকে এক করে ফেলি। পানি প্রকৌশলগত ভাবে সাধারণত বাঁধ হলো নদীতে আড়াআড়ি ভাবে অর্থাৎ প্রবাহের সাথে সমকোণে স্থাপিত কোনো প্রতিবন্ধক যা প্রবাহকে সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দেয়। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল স্থাপনা হলো একটি বাঁধ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কাপ্তাই বাঁধকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণত একটি খরস্রোতা নদীর প্রবাহকে বাঁধ দিয়ে আটকে বাঁধের উজানে জলাধার তৈরি করে পানির উচ্চতা বাড়ানো হয়। এতে পানির উচ্চতার সমানুপাতে স্থিতিশক্তি বেড়ে যায়।

বাঁধ দেওয়ার পর পানিকে শুধু আটকে রাখলেই চলে না, একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় যাবার পর জলাধারের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে এই পানিকে প্রবাহিত করতে হয়। এই পদ্ধতিতে স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং প্রচন্ড বেগে পানি প্রবাহিত হয়। সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রবাহিত পানির বেগকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘোরালে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সুতরাং, বিদ্যুৎ উৎপাদন যত বাড়ানো হয়, জলাধার থেকে ছেড়ে দেয়া পানির পরিমাণ তত বাড়ে। বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানির প্রবাহ বাড়লে তা জলাধারে আটকে রাখা হয়। ফলে, বাঁধের পরে ভাটি অঞ্চলে পানির প্রবাহ কমে যায়। আরও সঠিকভাবে বললে, ভাটিতে ঠিক ততটুকুই পানি পাওয়া যায় যা টারবাইনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে, শুষ্ক মৌসুমে উজান থেকে পানি কম এলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করার তাগিদে জলাধার থেকে নিয়মিত ভাবে পানি ছাড়তে হয়। ফলে, বাঁধের ভাটিতে পানির প্রবাহ আগের চেয়ে বাড়ে। বাঁধের ভাটিতে পানির প্রবাহ নির্ভর করে মূলত উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণের ওপর।

www.prakashayatan.com

চিত্র ১: হোভার ড্যাম [উইকিমিডিয়া কমন্স]

অন্যদিকে, ব্যারেজ হলো নদীর পানিকে একাধিক গেইট দিয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত করে এর উজানে পানির উচ্চতা কিছুটা বাড়ানো। প্রকৌশলের ভাষায় এ বর্ধিত উচ্চতাকে ‘এফ্লাক্স’ বলে।

চিত্র ২: তিস্তা ব্যারেজ [ইন্সটিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং, iwmbd.org]

ব্যারেজের ঠিক উজানে এক বা একাধিক কৃত্রিম খাল খনন করা হয় যার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ভাবে পানি প্রবাহিত করে অভিকর্ষের প্রভাবে আরও ছোট ছোট খাল দিয়ে (তিস্তা ব্যারেজ, বাংলাদেশ) বা পাম্পের মাধ্যমে (জি কে প্রকল্প, বাংলাদেশ) আবাদী জমিতে সেচ দেয়া হয় অথবা অন্য কোনো নদীতে পানি প্রবাহ বাড়ানো হয় (যেমন ফারাক্কা ব্যারেজ)। অর্থাৎ, ব্যারেজের মূল লক্ষ্যই থাকে একটি নদী থেকে পানি অপসারণ, অন্যদিকে বাঁধের মূল উদ্দেশ্য উজানে পানি সঞ্চয়।

আরেক ধরনের স্থাপনা হলো এমব্যাঙ্কমেন্ট বা ডাইক, যাকেও আমরা সাধারণ ভাষায় বাঁধ বলে থাকি। এটি একটি নদীর সমান্তরালে স্থাপিত উঁচু প্রতিবন্ধক বা রাস্তাবিশেষ (যেমন আশুলিয়ায় তুরাগ নদীর ধার দিয়ে ঢাকা রক্ষা বাঁধ)। এর কাজ মূলত বন্যার সময় পানিকে নদীর একপাশে বা দুই পাশেই যেতে না দেয়া।

চিত্র ৩: লুজিয়ানায় মিসিসিপি নদীর তীতে স্থাপিত ডাইক [উইকিমিডিয়া কমনস]

www.prakashayatan.com

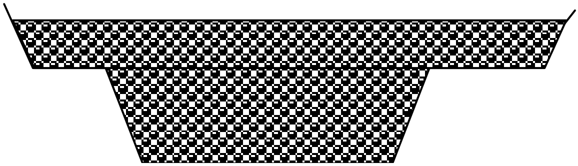

ক) বাঁধঃ নদীর প্রবাহকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়

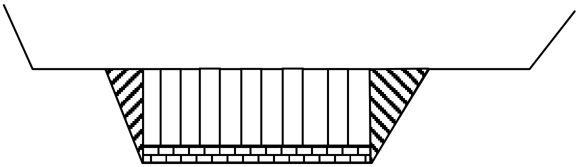

খ) ব্যারেজঃ নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত গেইট দিয়ে প্রবাহিত করে

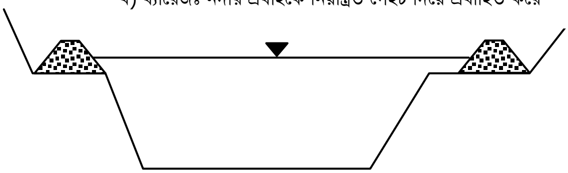

গ)ডাইক বা এম্ব্যাঙ্কমেন্টঃ নদীর দুইধারে বর্ধিত পানি প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে

চিত্র ৪: নদীর প্রস্থচ্ছেদ হতে দৃশ্যমান বাঁধ, ব্যারেজ, ও ডাইকের পার্থ্যক্য

২ টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প ও এর ইতিহাস

বরাক নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ধারণাটি আসে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার সাথে। ১৯৩০-এর দশকে আসামের কাছাড় উপত্যকায় এক ভয়াবহ বন্যা হওয়ার পর থেকে একটি দীর্ঘমেয়াদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা করা হয় যার অংশ হিসেবে ১৯৫৪ সালে ভারতের Central Water Commission (CWC) একটি বহুমুখী জলাধারের জন্য সমীক্ষার কাজ হাতে নেয় [২]। বাঁধ তৈরির জন্য মাইনাধর, ভুবনধর, ও নারাইনধর নামক আরও তিনটি প্রস্তাবিত স্থান প্রকৌশলগত কারণে বাতিল হয়ে যাওয়ায় ১৯৭৪ সালে বাঁধের চূড়ান্ত স্থান হিসেবে টিপাইমুখ নির্ধারিত হয় [২]। এই স্থানটি তুইভাই নদী ও বরাক নদীর সঙ্গমস্থল থেকে ৫০০ মিটার ভাটিতে এবং বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ২০০ কিমি উজানে [২,৩]। এই বরাক নদীই বাংলাদেশে প্রবেশের আগে দু’ভাগ হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে প্রবেশ করেছে, যা পরিশেষে মিলিত হয়ে মেঘনা নদী গঠন করেছে। এই সুরমা-মেঘনা নদী সিস্টেম গঙ্গা বদ্বীপ তৈরির তিনটি সিস্টেমের মধ্যে একটি।

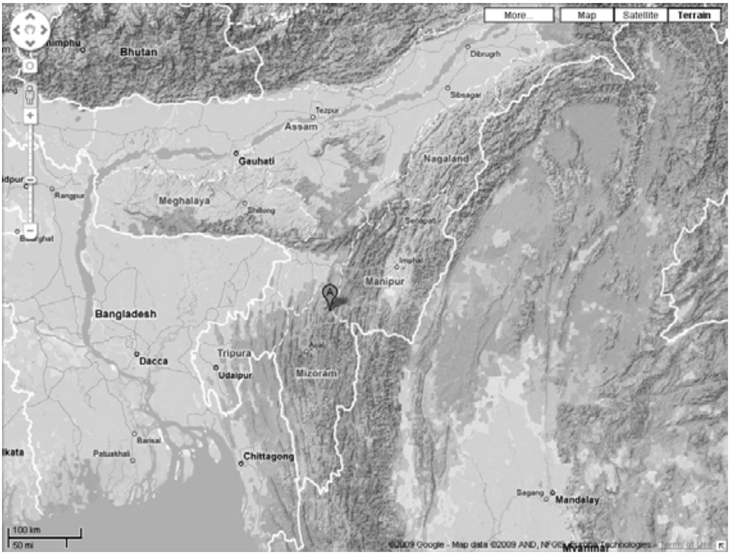

চিত্র ৫: প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধের অবস্থান [A চিহ্নিত, GoogleMap]

নির্মাণাধীন টিপাইমুখ বাঁধের সাধারণ তথ্যাবলি

নির্মাণাধীন টিপাইমুখ বাঁধের কিছু সাধারণ তথ্যাবলি [২] নিম্নরূপঃ

- বাঁধের ধরনঃ এটি রকফিল ড্যাম অর্থাৎ নদীর প্রবাহকে গ্র্যানুলার (দানাদার) মাটি দিয়ে ভরাট করা হবে এবং পানির প্রবাহকে এক বা একাধিক পানি অভেদ্য স্তর (যেমন স্টিল পাইল বা কংক্রিট, বা প্লাস্টিক পর্দা) দিয়ে রোধ করা হবে।

- বাঁধের উচ্চতাঃ ১৬২.৮ মিটার

- ন্যূনতম বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৩৪ মেগাওয়াট, তবে সর্বোচ্চ ১৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের ব্যবস্থা রাখা হবে।

- বাঁধের কারণে সৃষ্ট জলাধারের ফলে প্লাবিত এলাকা প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার যার প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ মণিপুর রাজ্যের ও ৫ ভাগ মিজোরাম রাজ্যের।

বাঁধ নির্মাণে ভারতের উৎসাহের পেছনে কিছু কারণ

- উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষদের উন্নয়নের পথে নিয়ে আসা যাবে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে গড় বিদ্যুতের ব্যবহার যেখানে ২৭০ কিলোওয়াট-ঘন্টা, সেখানে এই অঞ্চলে তা মাত্র ৮০ কিলোওয়াট-ঘন্টা।

- এটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে বাৎসরিক ৪৫ কোটি রুপির ক্ষতি রোধ করবে।

- টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প থেকে ৯৫ কিলোমিটার ভাটিতে ফুলেরতল ব্যারেজ নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে যা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ছেড়ে দেয়া পানিকে কাজে লাগিয়ে প্রায় ১,২০,৩৩৭ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসবে।

- প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদে মৎস্য চাষের মাধ্যেমে বার্ষিক আয় হবে ১৪ কোটি রুপি।

- প্রকল্প এলাকা একটি উৎকৃষ্ট পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হবে।

www.prakashayatan.com

- সৃষ্ট হ্রদ উজানের এলাকার মানুষদের নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে, সেই সাথে প্রকল্পের ফলে বছরের বিভিন্ন সময় নদীর পানির গভীরতার উঠা-নামা কমে যাওয়ায় কলকাতা বন্দর থেকে বাংলাদেশ হয়ে শিলচর পর্যন্ত পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্যতা দেখা যাবে।

৩ বাঁধের উজান ও ভাটিতে সম্ভাব্য প্রভাব

একটি বাঁধের প্রভাব এর প্রবাহের দুই দিকেই (উজান ও ভাটি) পরিলক্ষিত হয়। যেকোনো বাঁধই তার উজানে একটি কৃত্রিম জলাধার তৈরি করে এবং এই জলাধারকে কেন্দ্র করে উজানে বাঁধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে ভাটিতে মূল সমস্যা সৃষ্টি করে বাঁধের কারণে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ। ভাটির প্রাকৃতিক প্রবাহ বাঁধের কারণে কৃত্রিম ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রবাহের মান ও বছরের বিভিন্ন সময়ে তার বন্টনের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় নদীর ওপর নির্ভরশীল জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ।

সাধারণ ভাবে একটি বাঁধের উজান ও ভাটিতে প্রভাব এ পরিচ্ছেদের প্রাথমিক আলোচ্য। পরবর্তী পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের FAP-6 [Flood Action Plan 6] রিপোর্ট, IWM[Institute of Water Modeling] এর রিপোর্ট ও ভারতের টিপাইমুখ প্রকল্পের EIA [Environmental Impact Assesment] রিপোর্টের আঙ্গিকে টিপাইমুখ বাঁধের কিছু বিশেষ প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে।

বাঁধের উজানে প্রভাব

খুব সাধারণ ভাবে দেখলে একটি বাঁধের কারণে এর উজানে নিম্নরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়ঃ

- সৃষ্ট কৃত্রিম জলাধার বিপুল পরিমাণ এলাকাকে পানির নিচে নিমজ্জিত করে, ফলে আগে যেখানে শুষ্ক এলাকা ছিল তা জলাভূমিতে পরিণত হয়। এর ফলে অনেক ঘরবাড়ি ও আবাদী জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। সেই সাথে তলিয়ে যায় বিপূল পরিমাণ বনভূমি ও অন্যন্য উদ্ভিদ। এসব উদ্ভিদ পঁচে বিপুল পরিমাণ কার্বন পরিবেশে নিঃসরণ করে, যা বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস বাড়ায়।

- আগে যেখানে ছিল নদী, সেখানে আজ জলাধার, ফলে পানির উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেড়ে যায় বহুগুণ। আমরা জানি, পানির উপরিতলের ক্ষেত্রফল যত বাড়ে, এর স্বতঃবাষ্পীভবনের হারও তত বাড়ে। সুতরাং, বাঁধ নির্মাণের পর নদী থেকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে স্বতঃবাষ্পীভূত হবে। এর পরিমাণ নেহায়েত কম নয়। এক হিসেব অনুযায়ী আমেরিকার হোভার ড্যামের কারণে সৃষ্ট লেক মেড থেকে বাৎসরিক ৩৫০ বিলিয়ন গ্যালন পানি কমে যায় এবং এটি প্রকারান্তরে নদীর পানির প্রবাহকে কমিয়ে দেয়।

- বাঁধের সবচাইতে বড় প্রভাব হলো বাস্তুসংস্থান বিপর্যয়। বাঁধের উজানে স্বাভাবিক ভাবেই একটি স্থলজ বাস্তুসংস্থান ছিল। সেটি সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করে কৃত্রিম ভাবে একটি জলজ বাস্তুসংস্থান তৈরি করা হয়। এর ফলে অনেক প্রজাতির স্থলজ প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

- অনেক প্রজাতির মাছ বছরের একটি বিশেষ সময়ে ভাটি থেকে উজানে চলে যায়। বাঁধের কারণে মাছের এই

অভিবাসন সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হয়, ফলে এর উৎপাদন কমে যায় বা নিঃশেষ হয়ে যায়।

- নদীর প্রবাহে শুধু পানি থাকেনা। নদী বয়ে নিয়ে চলে বিপুল পরিমাণ পলি। বাঁধ দেওয়া হলে এর উজানে নদীর গতিবেগ প্রায় শূন্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় নদীর পানির পক্ষে এই পলি আর ধরে রাখা সম্ভব হয়না। বয়ে আনা পলি অভিকর্ষের প্রভাবে ধীরে ধীরে নিচে পড়ে যায়, এবং জলাধারের বুকে জমতে থাকে। এটি এক পর্যায়ে জলাধারের নিচের স্তরের উচ্চতা বাড়িয়ে দেয়।

বাঁধের ভাটিতে প্রভাব

- সাধারণত বাঁধ নির্মাণাধীন অবস্থায় নদীর যে-স্থানে বাঁধ হবে তার উজান থেকে বিকল্প পথে পানিকে ভাটিতে স্থানান্তর করা হয়। নির্মাণের পর প্রথম যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো, বাঁধ নির্মাণ শেষ হলে সেটি কত সময় ধরে উজানের জলাধারকে পরিপূর্ণ করবে। এটি যদি দ্রুত পরিপূর্ণ করা হয়, তাহলে প্রায় সিংহভাগ পানি অপসারিত হবে, ভাটিতে যার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হবে ভয়াবহ [৩]।

- বাঁধের কারণে উজানে নদী তার প্রায় সমস্ত পলি জলাধারের নিচে সঞ্চিত করে ফেলে। জলবিদ্যুৎ টারবাইনের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ পানি বের হয় সেটিই মূলত ভাটিতে পরিবাহিত হয়। এই প্রবাহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে পলিমুক্ত হওয়ায় তার পলি ধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ। এই পানি ভাটিতে প্রবাহিত হওয়ার সময় নদীর বুক আর পাড় থেকে মাটি নিয়ে যায়। এর ফলে নদীক্ষয়ের পরিমাণ বিপুলাংশে বেড়ে যায়।

www.prakashayatan.com

- জলবিদ্যুৎ বাঁধের কারণে স্বভাবতই বর্ষা মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে যায়, ফলে ভাটি অঞ্চলের স্বাভাবিক জলজ বাস্তুসংস্থান ব্যাহত হয়। অনেক জলজ প্রাণীর প্রজননের সাথে বাৎসরিক বন্যা সম্পর্কযুক্ত। বর্ষা মৌসুমে পানি কমে যাওয়ায় এসব প্রাণীর স্বাভাবিক প্রজনন ব্যাহত হয়। এছাড়া বন্যার সময় আশে-পাশের স্থলাভূমি থেকে জলজ প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য নদীতে আসে। একটি নদীর স্বাভাবিক বন্যা যখন ব্যাহত হয়, তখন এই প্রক্রিয়াটিও বাধাগ্রস্ত হয়। নদীর দুই ধারে নদীকে কেন্দ্র করে এক ধরনের উদ্ভিদ জন্মায় যাকে 'রাইপেরিয়ান ভেজিটেশন' বলা হয়। এই উদ্ভিদগুলো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক বন্যা চক্রের সাথে অভিযোজিত। বাঁধের কারণে ভাটিতে স্বাভাবিক বন্যা ব্যাহত হলে ধীরে ধীরে এই অভিযোজন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, এবং ফলশ্রুতিতে এদের বিলুপ্তি ঘটে।

- নদীর সব গভীরতায় পানির বেগ একরকম নয়। সাধারণত নদীর তলদেশে বেগ কম থাকে, আর উপরিতলের ঠিক পূর্বে বেগ সর্বোচ্চ থাকে। উলম্ব তল বরাবর পানির এই বেগের পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে নদীর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের মাছ অভিযোজিত হয়। বাঁধের কারণে যখন নদীর স্বাভাবিক এই বেগ পরিবর্তিত হয়, তখন মাছের স্বাভাবিক এই অভিযোজন বিনষ্ট হয়।

- সাধারণত সমতল ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো এর নিম্নাঞ্চল। প্রাকৃতিক নিয়মে বর্ষা মৌসুমে নদীর পানি উপচে গিয়ে এই সব জলাভূমিগুলো পানিপূর্ণ হয়, এবং সারা বছরের জন্য জলজ প্রাণীর একটি অভয়াশ্রমে পরিণত হয় (উদাহরণঃ

বাংলাদেশের হাওড়গুলি)। এই নিম্নাঞ্চলগুলি শুষ্ক মৌসুমে পানির মজুদ হিসেবে কাজ করে, যা থেকে ছোট ছোট নদী বা খালগুলি বেইজ ফ্লো হিসেবে পানির যোগান পায়। বাঁধের কারণে স্বাভাবিক বন্য ব্যাহত হলে এই নিম্নাঞ্চলগুলি সঠিক সময়ে পানি পাবেনা, এবং এদের স্বাভাবিক মরফোলজি ব্যাহত হবে। সেই সাথে শুকিয়ে যাবে এর ওপর নির্ভরশীল ছোট ছোট নদীগুলো।

- নদীর পানির গভীরতা কম বলে সাধারণত এতে পানির তাপমাত্রা প্রায় ধ্রুব থাকে। বাঁধের কারণে উজানে যে-জলাধার সৃষ্ট হয়, তা বেশ গভীর হয়ে থাকে। এই জলাধারের উপরিতল সূর্যের আলোর সংস্পর্শে থাকে বলে তাপমাত্রা বেশি হয়। নিচের দিকে তুলনামূলক ভাবে নিম্ন তাপমাত্রার পানি থাকে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইনগুলি থাকে জলাধারে তলদেশে, তাই অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রার পানি টারবাইনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাটির নদীতে গিয়ে পড়ে। অনেক জলজ অণুজীব আছে যারা পানির তাপমাত্রার একটি বাৎসরিক চক্রের ওপর নির্ভরশীল [১০]। এই জীবনচক্রের ব্যত্যয় হলে এদের অনেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

- বাঁধের কারণে মাছের স্বাভাবিক অভিবাসন সম্পূর্ণ রূপে ব্যাহত হয়, তাই প্রকারান্তরে আমরা একটি নদীতে বাঁধ দিয়ে তার ভাটির মৎসসম্পদ প্রায় ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই।

- বাঁধের কারণে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বেড়ে যায়। ভাটির অঞ্চলে সাধারণত এই সময়ে চাষাবাদ শুরু হয়। এই বর্ধিত পানির ফলে স্বাভাবিক কৃষি আবাদ প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে।

- ভাটি অঞ্চলে বাঁধের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব পরিলক্ষিত হবে বাঁধের ভাঙনে। যদি কোনো কারণে বাঁধ ভেঙে যায়, তাহলে যেই উচ্চতা ও তরঙ্গে ঢেউ তৈরি হবে তা ভাটি অঞ্চলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

উজান ও ভাটির ওপর সাধারণ প্রভাব

- বাঁধের যেই প্রভাবটি উজান-ভাটি দুই অঞ্চল, এমনকি স্বয়ং বাঁধের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে তা হলো এর বিপুল পরিমাণ পানির ওজনে মাটির অভ্যন্তরে চাপ বৃদ্ধি ([৪],[৭])। এই বর্ধিত চাপ অনেক সময় ভূমিকম্পের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এ নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে, তবুও এটিকে একেবারে অমূলক বলা যায়না।

- বাঁধের কারণে সৃষ্ট জলাধারের উপরিতলের ক্ষেত্রফল নদীর উপরিতলের চেয়ে অনেক বহুগুণ বেশি হওয়ার ফলে এই অঞ্চলের স্বতঃবাষ্পীভবন বেড়ে যাবে। স্বতঃবাষ্পীভবন বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করে। ফলে, বাঁধের অঞ্চলের জলবায়ু কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হয়।

৪ বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাব

যেকোনো বাঁধের প্রভাব আলোচনা করার জন্য প্রয়োজন একটি সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত গবেষণা।

কী ধরনের গবেষণা প্রয়োজন

- **পূর্ণাঙ্গ ভৌত মডেলঃ**
  এই মডেল পুরো প্রকল্প ও এর প্রভাব পড়ে এমন এলাকার (বরাক-সুরমা-মেঘনা অববাহিকা) একটি ল্যাবরেটরী সংস্করণ হবে। এ-ধরনের মডেল অত্যন্ত ব্যয়বহুল, এবং এর জন্য বিপুল পরিমাণ উপাত্ত প্রয়োজন। জানামতে, বাংলাদেশের কাপ্তাই বাঁধের জন্য এরকম একটি মডেল বানানো হয়েছিল। সঠিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করতে এটি ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের জন্যই প্রয়োজন।

- **গাণিতিক হাইড্রোলজিকাল মডেলঃ**
  হাইড্রোলজিকাল মডেল মূলত পানির পরিমাণ নিয়ে কাজ করে। সমগ্র বরাক-সুরমা-মেঘনা অববাহিকার জন্য এই মডেল সেট-আপ করতে হবে। ইনপুট হিসেবে দিতে হবে

www.prakashayatan.com

ভূপ্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, মাটির প্রকৃতি, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, এবং আরও অনেক কিছু। টিপাইমুখ বাঁধ হলে এর অববাহিকায় পানির পরিমাণের কী প্রভাব পড়বে তা এই স্টাডি থেকে জানা যাবে।

- **গাণিতিক হাইড্রোলিক মডেলঃ**
  এই মডেল উজানে পানির প্রবাহকে হিসেবে নিয়ে ভাটিতে মডেলের শেষ সীমা পর্যন্ত পানির উচ্চতা ও গতিবেগ প্রদান করে। এই দুই মৌলিক উপাত্ত (উচ্চতা ও গতিবেগ)-কে ব্যবহার করে আরও প্রয়োজনীয় অনেক উপাত্ত বের করা যায়। টিপাইমুখের ক্ষেত্রে উজানের ইনপুট হিসেবে টিপাইমুখ বাঁধের প্রবাহ চিত্র (ডিসচার্জ কার্ভ) অর্থাৎ ভারত বছরের কোন দিন কী পরিমাণ পানি ছাড়বে তার একটি হাইড্রোগ্রাফ ব্যবহার করতে হবে, এবং এর সীমা হবে ন্যূনতম চাঁদপুর পর্যন্ত। এটি দিয়ে 'ড্যাম ব্রেক' স্টাডিও করা যাবে।

- **গাণিতিক মরফোলজিকাল মডেলঃ**
  প্রাপ্ত পানির গতিবেগ ও উচ্চতা থেকে নদীর বুক থেকে কী পরিমাণ পলি অপসারিত হবে বা জমা হবে তা এই মডেল বের করবে। সেই সাথে নদীর পাড় কোথায় কতটুকু ভাঙবে, তা-ও এই মডেল থেকে জানা যাবে।

- **গাণিতিক হ্যাবিটেট মডেলঃ**
  নদীতে একেক গভীরতায় একেক প্রকার মাছ এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ পাওয়া যায়, কারণ তারা ঐ স্তরের গতিবেগের সাথে অভিযোজিত। গাণিতিক হ্যাবিটেট মডেল হাইড্রোলিক মডেল থেকে প্রাপ্ত পানির গতিবেগ আর উচ্চতাকে ইনপুট হিসেবে নিয়ে টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাবে

পরিবর্তিত প্রবাহের সাথে সাথে এর ভাটির নদীর ও সংলগ্ন হাওড় এলাকার হ্যাবিটেটের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দেবে।

- **আঞ্চলিক জলবায়ু মডেলঃ**
  এই মডেল GCM (General Circulation Model) থেকে উপাত্ত নিয়ে টিপাইমুখ বাঁধ ও এর প্রভাব পড়ে এমন এলাকার জন্য এই বাঁধের কারণে ভবিষ্যতে জলবায়ূ পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাত্তের পরিবর্তনের সিমুলেশন করবে।

টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে এখনও পর্যন্ত স্বীকৃত গবেষণার উৎস

- Northeast Regional Water Management Plan (FAP-6) [৮]।
- টিপাইমুখ প্রকল্পের জন্য NEECOO এর EIA রিপোর্ট [২]।
- IWM (Institute of Water Modeling) এর টিপাইমুখের ওপর একটি অপ্রকাশিত স্টাডি যা ২০০৫-এ একটি কর্মশালায় উপস্থাপিত প্রবন্ধে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। [১১]।

FAP-6 রিপোর্ট অনুসারে টিপাইমুখ বাঁধের বাংলাদেশে প্রভাব

১৯৯৪ সালে প্রকাশিত FAP-6 মূলত বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ভবিষ্যৎ পানি ব্যবস্থাপনা (NERP) নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে [৮]। টিপাইমুখ বাঁধ তখন পরিকল্পনাধীন থাকায় এই গবেষণায় এই বাঁধের সম্ভাব্য প্রভাবের দিকগুলি আলোকপাত করা ও ভবিষ্যৎ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আঞ্চলিক হাইড্রোলজিক প্রভাবের ওপর গবেষণা

করার জন্য Surface Water Modeling Center (সংক্ষেপে SWMC; বর্তমান Institute of Water Modeling, IWM) ও NREP দলের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সেট-আপ করা Northeast Regional Model ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এটি মূলত 1-Dimensional বা একমাত্রিক গাণিতিক হাইড্রোলিক মডেল এবং জটিলতা এড়ানোর জন্যে এতে নদীর মরফোলজি (গতিবেগের সাথে নদীর পলি ও গভীরতা পরিবর্তন) বিবেচনা করা হয়নি।

এ-ধরনের গবেষণায় সাধারণত একটি প্রাথমিক দৃশ্যপট বা 'বেইজ সিনারিও' দিয়ে মডেল রান করা হয় ক্যালিব্রেশনের জন্য। মডেল ক্যালিব্রেশন হলো মডেল চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কিছু উপাত্তের মান বের করা। এটি করা হয় মডেল থেকে প্রাপ্ত ফলাফল আর পর্যবেক্ষনকৃত উপাত্তের তুলনা করে। এই দুইয়ের মধ্যে চেষ্টা করা হয় সর্বোচ্চ সম্পর্ক স্থাপন করতে।

NREP এর গবেষণায় বেইজ সিনারিও ছিল ১৯৯১-১৯৯২। বেইজ সিনারিও রান করবার পর আরও দুটি সিনারিও সেট-আপ করা হয়। একটি 'পরিকল্পনাবিহীন ভবিষ্যৎ সিনারিও', অন্যটি 'পরিকল্পনা সহ ভবিষ্যৎ সিনারিও'। এই দুইয়ের ফলাফলের পার্থক্যই বিভিন্ন উন্নয়ন/পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। এই দুই ভবিষ্যৎ সিনারিওতে ২০১৫ পর্যন্ত আলোকপাত করা হয়, এবং এতে টিপাইমুখ বাঁধ/কাছাড় সেচ প্রকল্প (ফুলেরতল প্রকল্প) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, রিপোর্টে এই টিপাইমুখ বাঁধ/কাছাড় সেচ প্রকল্পের উপাত্তের সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। এই গবেষণা বড়জোর একটি সাধারণ ধারণা দিতে পারবে, কিন্তু এটি থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসার চিন্তা করা সমীচিন হবেনা। এই গবেষণায় টিপাইমুখ বাঁধ ভেঙে গেলে তার কী প্রভাব হবে সেটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং এক্ষেত্রে MIKE-11 (একটি ড্যানিশ গাণিতিক মডেল) ব্যবহার করা হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাঁধ ভেঙে গেলে কী হবে তা

"শুধু মাত্র ইলাস্ট্রেশন এর জন্য" দেখানো হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গাণিতিক মডেল নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা জানেন এই মডেলগুলো সেট-আপ করা কতটা উপাত্তনির্ভর। যেহেতু টিপাইমুখ বাঁধের প্রয়োজনীয় উপাত্ত সেই অর্থে উন্মুক্ত নয়, তাই এই মডেলের ফলাফলকে ভবিষ্যতের জন্য ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, অবশ্যম্ভাবী হিসেবে নয়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগ করে রাখা ভালো। এই গবেষণার সময় বাংলাদেশ যুক্ত নদী কমিশনের মাধ্যমে টিপাইমুখ বাঁধের প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু ন্যূনতম উপাত্ত নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পরিশেষে তাই কিছু ধারণার ওপর নির্ভর করতে হয়। ধারণাগুলি হলো,

- সেচের জন্য পানি উত্তোলন হবে ১ মিটার,
- পানি অপসারণ ক্রমাগত ভাবে শুষ্ক মৌসুম (নভেম্বর থেকে এপ্রিল) পর্যন্ত চলবে।

এই গবেষণা অনুযায়ী টিপাইমুখ বাঁধ/কাছাড় সেচ প্রকল্পের প্রভাব নিম্নরূপ।

জলাধার পূরণের সময়কার প্রভাব

এটি মুলত বাঁধের জলাধার কীভাবে পূর্ণ করবে তার পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশিল। অনেক সময় প্রকল্পের সুবিধা তাড়াতাড়ি পাবার জন্য অতিদ্রুত জলাধার পূর্ণ করা হয়, যা বাংলাদেশের মত ভাটির অঞ্চলে ভয়াবহ পরিবেশ – বিশেষত বাস্তুসংস্থান – বিপর্যয় ঘটাবে।

বর্ষা মৌসুমে প্রভাব

বন্যার পানির প্রবাহ কমে যাবে। অমলসিদে, অর্থাৎ যেখানে বরাক নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে সেখানে, বরাক নদীর "সর্বোচ্চ

প্রবাহ” ২৫ শতাংশ হ্রাস পাবে এবং পানির পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ কমে যাবে। পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় অমলসিদে বরাক নদীর পানির উচ্চতা ১.৬ মিটার কমে যাবে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীতে পানি প্রবাহ প্রায় সমভাবে হ্রাস পাবে, যা প্রকারান্তরে এই দুই নদীতে বন্যার সম্ভাব্যতা কমিয়ে দেবে। ফলস্বরূপ সিলেট অববাহিকায় নিম্নাঞ্চলের জলাবদ্ধতার প্রকোপ হ্রাস পাবে।

শুষ্ক মৌসুমে প্রভাব

অমলসিদে পানির সর্বোচ্চ প্রবাহ শতকরা ১০০ ভাগ থেকে ২০০ ভাগ বাড়বে এবং পানির পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ বেড়ে যাবে। এই বর্ধিত প্রবাহের কারণে অমলসিদে পানির উচ্চতা ১.৭ মিটার বেড়ে যাবে।

বাঁধ ভাঙার প্রভাব

বাঁধ ভাঙার কারণে বাঁধের স্থলে যে ঢেউ উৎপন্ন হয় তা সাধারণত ঘন্টায় ১০ থেকে ৩০ কিলোমিটার বেগে ভাটির দিকে ধাবিত হয়। এই বেগ ক্রমে হ্রাস পায়। বাঁধ স্থল থেকে অমলসিদের দূরত্বকে ২০০ কিলোমিটার ধরলে এই ঢেউ বাংলাদেশে প্রবেশ করতে সময় লাগবে ২৪ ঘন্টা। বাংলাদেশে প্রবেশের সময় এই ঢেউয়ের উচ্চতা হবে ৫ মিটার। টিপাইমুখ বাঁধের জলাধারের ধারণ ক্ষমতা ১৫,০০০ মিলিয়ন ঘনমিটার। এই বিপুল প্রবাহ ১০ দিন ধরে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং সমস্ত বন্যার্ত এলাকা থেকে পানি সরে যেতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে।

IWM-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাব

টিপাইমুখ বাঁধের গবেষণার ওপর IWM-এর প্রকাশিত কোনো রিপোর্ট নেই। সেপ্টেম্বর ২০০৫ এ কেনিয়ার নাইরোবিতে United Nations Environment Programme (UNEP) কর্তৃক আয়োজিত

'Dams and Development Project' শীর্ষক কর্মশালায় বাংলাদেশের মোঃ গোলাম কিবরিয়া "Issue – Gaining Public Acceptance for Large Dams on International Rivers: The Case of Tipaimukh Dam in India and Concerns in Lower Riparian." শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যেখানে IWM-এর টিপাইমুখের ওপর একটি অপ্রকাশিত স্টাডি তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই রিপোর্টে টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাব নিম্নরূপঃ

হাইড্রোলজির ওপর প্রভাব

টিপাইমুখ বাঁধ পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করলে অমলসিদে বরাক নদীতে বর্ষা মৌসুমে গড় প্রবাহ নিম্নরূপে পরিবর্তিত হবে।

- জুন মাসে ১০% হ্রাস পাবে,
- জুলাই মাসে ২৩% হ্রাস পাবে,
- আগষ্ট মাসে ১৬% হ্রাস পাবে,
- সেপ্টেম্বর মাসে ১৫% হ্রাস পাবে।

তুলনামূলক ভাবে শুষ্ক বর্ষা মৌসুমে এই গড় প্রবাহ-পরিবর্তন নিম্নরূপে হবে। প্রবন্ধে শুষ্ক মৌসুমের প্রবাহ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।

- জুলাই মাসে ২৭% হ্রাস পাবে,
- আগষ্ট মাসে ১৬% হ্রাস পাবে,
- সেপ্টেম্বর মাসে ১৪% হ্রাস পাবে।

নদী ও হাওড়ের বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাব

- সিলেট এবং মৌলভীবাজারের হাওড়গুলো বর্ষা মৌসুমে বন্যা দ্বারা প্লাবিত হয়, এবং এটিকে ঘিরেই এর বাস্তুতন্ত্র আবর্তিত হয়। টিপাইমুখ বাঁধের ফলে সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার জলাভূমি আগের থেকে গড়ে যথাক্রমে ২৬% ও ১১% কমে যাবে।
- সুরমা কুশিয়ারা নদী সিস্টেমের উপরের দিকের শতকরা ৭১ ভাগ অঞ্চল গড় বর্ষা কালে বন্যাপ্লাবিত হবেনা।
- কুশিয়ারা নদীর বা'তীরে অবস্থিত কুশিয়ারা-বর্দাল হাওড় গড় বর্ষার সময় পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে।
- কাওয়ারদিঘী হাওড় এর ২৬% প্লাবন এলাকা হারাবে।
- হাকালুকি হাওড় এবং দামীর হাওড় এর ওপর তুলনামূলক প্রভাব কম পড়বে।

মরফোলজির (নদীর গভীরতা ও গতিপথ) ওপর প্রভাব

বাঁধের কারণে এর সুড়ংগ দিয়ে যে পানি নির্গত হবে তাতে পলির পরিমাণ শূন্য হয়ে যাবে, যা ভাটি অঞ্চলে ব্যাপক নদীক্ষয়ের সৃষ্টি করবে। এই নদীক্ষয় ১০০ থেকে ১৫০ কিমি দীর্ঘায়িত হতে পারে। বাংলাদেশ বাঁধ থেকে ২০০ কিমি ভাটিতে, অর্থাৎ নদীক্ষয়ের কারণে সৃষ্ট এই বিপুল পরিমাণ পলি বাহিত হয়ে আসবে বাংলাদেশে। এই পলি বরাক নদীর নিচের অংশে – যেখানে তা সুরমা আর কুশিয়ারায় বিভক্ত হয়েছে – জমা হবে। বর্ষার শেষ দিকে এই পলি সঞ্চয়ের হার আরও বেড়ে যাবে। এই বেড়ে যাওয়া পলি কুশিয়ারা নদীর বেশ কিছু শাখানদীর মুখ বন্ধ করে দিতে পারে।

ভারতের EIA রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে টিপাইমুখের প্রভাব

নিপকোর টিপাইমুখ বাঁধের ওপর তৈরি করা পরিবেশগত প্রভাব রিপোর্টটির (EIA) “Impact of The Project on Environment” [২] শীর্ষক পরিচ্ছেদটিতে মূলত বাংলাদেশের এই বাঁধের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করার কথা । প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে জলাধারের কারণে এর উজান কী কী প্রভাব পড়বে তার সব কিছুই উল্লেখ আছে, কিন্তু ভাটিতে কী হবে তার ওপর আছে মাত্র একটি অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদটি সরাসরি উদ্ধৃত করা হলো [২]।

> In a study made to examine the environmental and economic impact at the down stream at pre and post project scenario, it is found that average water availability at down stream for monsoon season at post dam condition will decrease by 30% in comparison to pre-dam condition and thereby will provide relief to down stream population from recurring annual flood havoc. Similarly, due to regulated flow from reservoir, the non-monsoon flow will increase by 110 percent, which will provide irrigation benefit for Rabi crops.

অর্থাৎ, বাঁধের কারণে বর্ষা মৌসুমে পানি ৩০% কমে যাবে এবং শুষ্ক মৌসুমে ১১০% বেড়ে যাবে, এবং এই বর্ধিত পানি দিয়ে সেচের মাধ্যমে রবি শস্য ফলানো যাবে।

www.prakashayatan.com

৫ সমন্বিত বিশ্লেষণ

বর্ষাকালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ফলে বন্যার প্রকোপ হ্রাস কতটা যুক্তিযুক্ত ও ইতিবাচক

FAP-6, IWM, কিংবা টিপাইমুখ প্রকল্পের EIA রিপোর্টে যেটি প্রথমেই উঠে এসেছে তা হলো বাঁধের কারণে বর্ষা মৌসুমে পানি প্রবাহের হ্রাস এর বিষয়টি। FAP-6 এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাঁধের কারণে বর্ষা মৌসুমে অমলসিদে পানির সর্বোচ্চ প্রবাহ ২৫% কমবে ও পানির পরিমাণ ২০% কমবে। অন্যদিকে IWM-এর রিপোর্টে (অপ্রকাশিত) উঠে এসেছে যে জুন, জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে পানির প্রবাহ হ্রাস পাবে যথাক্রমে ১০%, ২৩%, ১৬%, ১৫%, অর্থাৎ এই চার মাসে গড়ে ১৬% প্রবাহ কমবে। একই চিত্র দেখা যায় ভারতের EIA রিপোর্টে, যেখানে ৩০% প্রবাহ হ্রাসের কথা বলা হয়েছে।

এই পানি প্রবাহ হ্রাসের কথা বলে যুক্তি দেয়া হচ্ছে যে এর ফলে ভাটিতে অর্থাৎ বাংলাদেশে ‘ফ্ল্যাশ ফ্লাড’ কমবে, এবং সিলেট ও মৌলভীবাজার এলাকা সহ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বন্যামুক্ত হবে। বিষয়টি কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেটি এক বাক্যে বলা যায়না। এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় চলে আসে।

বন্যা কি সত্যিই কমবে?

বাংলাদেশের বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ ডঃ আইনুন নিশাত এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন [৪],

বরাক নদীর ভাটির দিকের অঞ্চল সিলেটের হাওড় এলাকায় বর্ষার শুরুতে আগাম বন্যা হয় আবার বর্ষার শেষের দিকে পানি কমে আসে। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের পর বর্ষার শুরুতে রিজার্ভারে পানি ধরে রাখার প্রয়োজন পড়বে আবার বর্ষার শেষের দিকে পানি ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। এর ফলে বর্ষার শুরুতে বন্যা কমে আসতে পারে আবার বর্ষার শেষে বন্যার প্রকোপ বাড়তে পারে। এর প্রভাব বাংলাদেশের ওপরেও পড়বে।

অর্থাৎ, বন্যামুক্ত হবার যে-কথা বলা হচ্ছে, তা পুরোপুরি সঠিক নয়। সম্ভবত বন্যার স্বাভাবিক সময় পরিবর্তিত হতে পারে শুধু।

আরও যে-বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, বাঁধের কারণে এর উজানে জলাধারে সব পলি সঞ্চিত হবে। যে-পানি বের হয়ে আসবে তাকে এক কথায় বলা যায় “Hungry Water”, বাংলায় যার পরিভাষা হতে পারে রাক্ষুসী পানি। এই পানি পলিমুক্ত বলে এর পলিধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। ফলে, এই পানি বাঁধের ভাটিতে ১০০ থেকে ১৫০ কিমি ব্যাপী ব্যাপক নদীক্ষয়ের সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশ বাঁধের ২০০ কিমি ভাটিতে থাকায় এই বিপুল পরিমাণ পলি বরাক নদী দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে, কিন্তু পানির প্রবাহ তুলনামূলক ভাবে কমে যাওয়ায় পলি বহন করার ক্ষমতা কমে যাবে, এবং তা সুরমা ও কুশিয়ারার বুকে জমা হবে। এতে নদীর নাব্যতা ও গভীরতা হ্রাস পাবে। সেক্ষেত্রে আগে যা স্বাভাবিক বর্ষাকালীন প্রবাহ ছিল, প্রকারান্তরে তা বন্যা আকারে আসতে পারে এই এলাকায়।

সিলেট ও মৌলভীবাজারের কথিত বন্যামুক্তি কতটা ইতিবাচক

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পানি বিশেষজ্ঞ ডঃ জহির উদ্দীন চৌধুরীর মন্তব্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য [৩]।

সাধারণভাবে আমরা ধরে নেই যে বন্যার সময় যদি পানি কমানো যায় এবং শুষ্ক মৌসুমে যখন পানির পরিমাণ কম থাকে তখন পানির সরবরাহ বাড়ানো যায় তা খুবই ভাল একটি বিষয়। সে বিবেচনা থেকেই ভারত টিপাইমুখ বাঁধের পেছনে তাদের যুক্তি হিসেবে এই বিষয়টি তুলে ধরেছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের একটি অনন্য বৌশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে রয়েছে বিশাল জলাভুমি ও অসংখ্য হাওড়। এর একটি নিজস্ব ইকোসিস্টেম রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে এখানে বর্ষার সময় পানি বাড়বে, বন্যা হবে ও শুষ্ক মৌসুমে অনেক এলাকা শুকিয়ে যাবে, এর ওপর ভিত্তি করেই সেখানকার ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছে। ফলে বন্যার পানি কমা বা শুষ্ক মৌসুমে পানি বেশি পাওয়ার যে আশ্বাস ভারত দিচ্ছে তা এই এলাকার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ মেঘনা-সুরমা-কুশিয়ারা অববাহিকার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এর হাওড়গুলি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে ছোট-বড় মোট ৪১১টি হাওড় প্রায় ৮,০০০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের এই অঞ্চলের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ। এই হাওড়গুলির কিছু হচ্ছে ‘রাইপেরিয়ান জলাভুমি’ (চিত্র ৬ দ্রষ্টব্য), অর্থাৎ প্লাবনভূমিতে অবস্থিত। এগুলো নদীর সাথে সরাসরি যুক্ত বলে নদীর প্রবাহ হ্রাস-বৃদ্ধি দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়। পক্ষান্তরে, কিছু হাওড় ‘নন-রাইপেরিয়ান জলাভূমি’ যা পানির যোগান পায় আশে-পাশের নদী থেকে ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ থেকে।

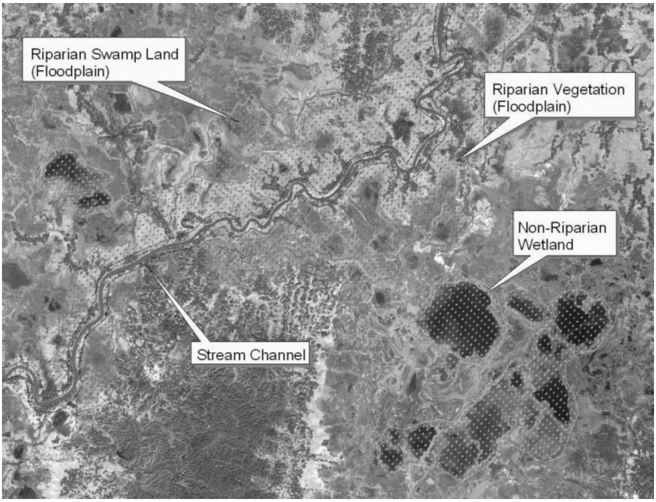

চিত্র ৬: রাইপেরিয়ান ও নন-রাইপেরিয়ান জলাভূমি

বর্ষাকালে পানির প্রবাহ কমে গেলে রাইপেরিয়ান হাওড়গুলোতে পানি যাবেনা, এবং ভূগর্ভস্থ প্রবাহ কমে যাওয়ায় নন-রাইপেরিয়ান হাওড়গুলিও পানি পাবেনা। বৃষ্টির পানি থেকে একমাত্র নন-রাইপেরিয়ান জলাভূমিগুলি পানির যোগান পেতে পারে কিন্তু তা এই হাওড়গুলির আয়তনের তুলনায় নগণ্য।

এই হাওড় এলাকার রয়েছে এক বিচিত্র বাস্তুতন্ত্র। এই হাওড়গুলি বর্ষা মৌসুমে দেখতে অনেকটা সমুদ্রের মত হয়, এবং বন্যার পানি সরে গেলে জলজ প্রাণী বিশেষত করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের অভয়াশ্রমে পরিণত হয়। বছরের একটি বিশেষ সময় ধরে এই হাওড় এলাকা জলপূর্ণ থাকে তাই এলাকার মানুষদের জন্য মৎস্য শিকার অন্যতম প্রধান পেশা।

বাঁধের কারণে বন্যার সময় পানি না আসায় এই হাওড়গুলি একসময় ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে, এবং সেই সাথে বিলুপ্ত হবে বেশ

www.prakashayatan.com

কিছু প্রজাতি। এই এলাকার বাসিন্দাদের তখন বর্ষা মৌসুমে জীবিকার জন্য অন্য কোনো পথ বেছে নিতে হবে।

শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ বৃদ্ধি কতটা ইতিবাচক ও কতটা নেতিবাচক

টিপাইমুখ বাঁধের কারণে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলা হচ্ছে। FAP-6 এর রিপোর্ট অনুযায়ী অমলসিদে পানির সর্বোচ্চ প্রবাহ শতকরা ১০০ ভাগ থেকে ২০০ ভাগ বাড়বে, এবং পানির পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ বেড়ে যাবে। অন্যদিকে টিপাইমুখ প্রকল্পের EIA রিপোর্টেও বলা আছে বাঁধের কারণে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ ১১০% বেড়ে যাবে। এই বর্ধিত পানি কি আমাদের জন্য আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ সেটা গবেষণার দাবী রাখে।

FAP-6 এর রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে এই বর্ধিত প্রবাহের ফলে নৌ-চলাচল, সেচ, ও মৎস্য চাষ বৃদ্ধি ঘটবে, কিন্তু কিছু কিছু এলাকা থেকে পানি নিষ্কাশন ব্যাহত হবে। ভারত যদি ভবিষ্যতে ফুলেরতল ব্যারেজ বাস্তবায়ন করে তাহলে এই সুবিধার কিছুই বাংলাদেশ পাবেনা।

যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এই হাওড়গুলি শুষ্ক মৌসুমে যখন শুকিয়ে যায়, তখন কৃষকরা সেখানে এই অঞ্চলের একমাত্র ফসল বোরো ধান বপন করে। এই ধান বর্ষা আসার আগেই ঘরে উঠে, যা এখানকার বাসিন্দাদের বছরের একমাত্র শর্করার যোগান দেয়। বাঁধের কারণে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বেড়ে গেলে এই এলাকার চাষাবাদ ব্যাহত হবার আশঙ্কা আছে। ডঃ জহির উদ্দিন চৌধুরীও তার সাক্ষাৎকারে এই বিষয়টি আলোকপাত করেছেন [৩]। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে এই বর্ধিত প্রবাহ চাষাবাদের জমিকে খুব বেশি প্লাবিত করবেনা, সেক্ষেত্রেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। এই জমিগুলো বন্যার সময় প্লাবিত হওয়ায় বিপুল

পরিমাণ পলি জমে। বর্ষা মৌসুমে পানি কমে যাওয়ায় তা আগের মত আর প্লাবিত হবেনা, ফলে জমিগুলো তাদের উর্বরতা হারাবে।

অতি-শুষ্ক মৌসুমে কী হবে

এ পর্যন্ত ভারতীয় সূত্রে পাওয়া তথ্যের সব কিছুই প্রকৃতপক্ষে গড় প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে। কখনও কখনও পর্যায়ক্রমে কিছু বছর থাকে যখন পানির প্রবাহ স্বাভাবিক গড় প্রবাহের তুলনায় অনেক কমে যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বরাক অববাহিকায় ১৯৭৯-১৯৮১ পর্যন্ত এরকম একটি পর্যায় গিয়েছে যখন শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে পানির অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক কম ছিল। টিপাইমুখ বাঁধ হবার পরে এরকম একটি সময় আবার যদি আসে, সেক্ষেত্রে বাঁধের উজানে জলাধারের পানির স্তর কমে যাবে।

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জলাধারের একটি প্রস্থচ্ছেদ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জলাধারের পানির স্তর যদি সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের (Firm Production) জন্য প্রয়োজনীয় স্তরের চেয়ে নিচে নেমে যায় (Critical level), সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকেনা। এই পরিস্থিতিতে শুষ্ক মৌসুমে বাঁধের টারবাইন থেকে যে পরিমাণ পানি ভাটিতে প্রবাহিত হবে তা বাঁধ-পূর্ব পরিস্থিতির সাথে তুলনা করলে অনেক কম। এই অতি-শুষ্ক মৌসুমের কারণে জলাধারের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় পরবর্তী বর্ষা মৌসুমে লক্ষ্য থাকবে বেশি পরিমাণ পানি সঞ্চয় করার, যা প্রকারান্তরে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমাবে এবং সেই সাথে বর্ষা মৌসুমে ভাটিতে পানির প্রবাহ আরও কমে যাবে। এই পরিস্থিতি তিন-চার মৌসুম ধরে চললে তা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসবে বাংলাদেশে।

অতি-বর্ষা মৌসুমে কী হবে

অতি-শুষ্ক মৌসুমের মতো অতি-বর্ষা মৌসুমও আমাদের চিন্তা করতে হবে। প্রত্যেক জলাধারের একটি নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা থাকে, সেই ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি পানি জলাধারে জমা হলে তা স্পিলওয়ে বা বিকল্প পথ দিয়ে ভাটিতে প্রবাহিত করা হয়, যেমনটা আছে আমাদের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। বরাক অববাহিকায় যদি পর পর কিছু অতি বর্ষা মৌসুম আসে সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্রা আগের মতোই থাকলে এই অতিরিক্ত পানি বিকল্প পথে বের করে দিতে হবে। বাঁধ হবার পর ভাটিতে মানুষের জীবন যাত্রা পরিবর্তিত হবে। মানুষ স্বভাবতই তাদের ঘরবাড়ি আগের মত উঁচু করে বানাবে না, বন্যার প্রকোপ কমে যাওয়ায় অববাহিকায় অধিক মানুষ বসবাস করবে। সেক্ষেত্রে অতি-বর্ষা মৌসুমে বাঁধের নিরাপত্তার জন্য অধিক পানি ছেড়ে দিলে তা ভাটিতে অকস্মাৎ বন্যার আশঙ্কা সৃষ্টি করতে পারে। এর উদাহরণ ভারতেই আছে।

সাধারণত যে অবস্থায় একটি বাঁধের "ওভারটপিং" (উল্টে পড়া)-এর সম্ভাবনা দেখা যায়, তখন সেটিকে রক্ষা করা হয় অধিক পানি ছেড়ে দিয়ে। ১৯৭৮ সালে ভকরা বাঁধ থেকে জরুরী ভিত্তিতে পানি অপসারণের কারণে পাঞ্জাবের প্রায় ৬৫,০০০ মানুষ গৃহহারা হয়েছিল। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে ভকরা বাঁধ প্রায় উল্টে পড়ার মত পরিস্থিতিতে গিয়েছিল, এবং ঐ মুহূর্তে পানি না ছাড়া হলে বাঁধ ভেঙে পাঞ্জাবের প্রায় অর্ধেক এলাকা প্লাবিত হতো [১২]।

ভূমিকম্পে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু

ভারতীয় ও বার্মিজ প্লেটের মিথস্ক্রিয়ার ফলে ভারত ও বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত। ভূতাত্ত্বিকভাবে টিপাইমুখ বাঁধ এলাকা এবং তদসংলগ্ন

অঞ্চল অসংখ্য ‘ফোল্ড ও ফল্ট’ বিশিষ্ট [১৩]। এই অঞ্চলে গত ১৫০ বছরে রিক্টার স্কেলে ৭ এর অধিক মাত্রার দু'টি ভূমিকম্প হয়েছে যার মধ্যে শেষটি ছিল ১৯৫৭ সালে। এই ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিলো টিপাইমুখ প্রকল্প থেকে পূর্ব-উত্তরপূর্ব দিকে মাত্র ৭৫ কিমি দূরে [১৩]।

এছাড়াও রয়েছে “জলাধার আবেশিত ভূমিকম্প” (Reservoir Induced Seismicity বা RIS) এর আশঙ্কা। ভারতের টিপাইমুখ প্রকল্পের EIA রিপোর্ট [২] অনুযায়ী এই বাঁধের ‘Full Reservoir Level’ সমুদ্র সমতল থেকে ১৭৫ মিটার উঁচুতে এবং এর তলদেশের গড় উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ২২.৫ মিটার উঁচুতে। অর্থাৎ, জলাধারের পানির গড় উচ্চতা ১৫২.৫ মিটার। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব জলাধারের পানির উচ্চতা ১৫০ মিটারের বেশি, তাদের ক্ষেত্রে RIS এর হার শতকরা ৩০ ভাগ [১৩]। টিপাইমুখ বাঁধও এই আশঙ্কাতে পড়ে।

বাঁধ ভেঙে যাওয়ার প্রভাব

বাঁধ ভেঙে গেলে পরিস্থিতি কেমন হবে, তার কিছুটা FAP-6 রিপোর্টের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে, তবে এর সবকিছুই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। একটি অতিসাম্প্রতিক (১৮ অগাষ্ট, ২০০৯) উদাহরণ হলো রাশিয়াতে সংস্কার কাজের সময় দক্ষিণ সাইবেরিয়ার সাইয়ানো শুশেনাস্কা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের বাঁধে পানির পাইপের বিস্ফোরণের ফলে এখনও পর্যন্ত ৬২ জন কর্মী নিখোঁজ আছে, যাদের অধিকাংশরই বাঁচার আশঙ্কা ক্ষীণ। পুরো বাঁধ ভেঙে গেলে এর ভয়াবহতা কী পরিমাণ হবে, তা এই দুর্ঘটনা থেকে সহজেই অনুধাবনযোগ্য।

অপ্রাকৃতিক পরিস্থিতি

এই প্রাকৃতিক কারণগুলো ছাড়াও যদি কোনো যান্ত্রিক কারণে বাঁধের টারবাইন অকার্যকর হয় অথবা গ্রিডের কোনো সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে টারবাইন ছাড়া অন্য কোনো পথ দিয়ে সেই সময়ে পানি প্রবাহের ব্যবস্থা থাকবে কিনা, বা থাকলেও তা সমুদ্র সমতল থেকে কত উচ্চতায় থাকবে সেটিও বিবেচ্য বিষয়।

ফুলেরতল ব্যারেজ নির্মিত হলে কী হবে

টিপাইমুখ প্রকল্পে বাঁধ থেকে ১০০ কিমি ভাটিতে একটি সেচ প্রকল্পের প্রস্তাব আছে। আপাতত বলা হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা রাখা হবে। এই প্রকল্প হলে কতটুকু পানি অপসারিত হবে তা তাৎক্ষণিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। এটি নির্ভর করে নিম্নোক্ত কিছু বিষয়ের ওপর।

- কমান্ড এরিয়া কত, অর্থাৎ কতটুকু জমিতে সেচ দেয়া হবে,
- কী ধরনের সেচ দেওয়া হবে,
- কতটুকু বৃষ্টিপাত হবে,
- কী ধরনের ফসলে সেচ দেয়া হবে,
- মাটির আর্দ্রতা ও পানি ধারণক্ষমতা কেমন,
- কী ধরনের মাটি,
- সেচ খালের দৈর্ঘ্য ও ধরন,
- বায়ুর আর্দ্রতা, এবং আরও অনেক কিছু।

কিছু সঙ্কট পরিস্থিতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন

- নদীর স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষার্থে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ কত,
- ভবিষ্যতে কমান্ড এরিয়া কতটুকু বাড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে উজানের প্রবাহ কীরূপ বা কতটুকু পরিবর্তিত হবে

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, পানি বন্টন নিয়ে মূল সমস্যাগুলো তৈরি হয় অতিশুষ্ক মৌসুমগুলিতে। একজন প্রকৌশলী যখন কোনো কিছু ডিজাইন করেন, তখন তাঁকে সবচেয়ে সঙ্কট পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হয়। টিপাইমুখ বাঁধের ফলে অতিশুষ্ক মৌসুমে পানি কীভাবে কমে যেতে পারে, তার একটি ধারণা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর সাথে যদি ব্যারেজ দিয়ে পানি অপসারণ করা হয়, তাহলে তার প্রভাব কী হবে তা সহজেই অনুমেয়।

ডঃ জহির উদ্দীন চৌধুরীও এই বিষয়টা উল্লেখ করেছেন তাঁর সাক্ষাৎকারে [৩]। যদি পানি অপসারণ আর অতি-শুষ্ক মৌসুমের প্রভাব একীভূত হয়, সেক্ষেত্রে বরাক নদীর প্রবাহ আশঙ্কাজনক ভাবে কমে যেতে পারে। বাংলাদেশে এই ঘটনার প্রভাব হবে আরেকটা ফারাক্কার মত।

এই বিষয়টিকে আরও ভাবিয়ে তুলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি। দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা আগের তুলনায় সংখ্যা ও প্রকোপে বেড়ে যায়। সেই বিচারে, ভবিষ্যতে খরার ফলে বরাক নদীতে প্রবাহ কমে গেলে ফুলেরতল ব্যারেজ ভাটিতে আরও সমস্যার সৃষ্টি করবে।

আরও যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বাঁধ ও ব্যারেজের উজানে দ্বৈত পলি সঞ্চয়। বাঁধের কারণে পলি জলাধারে সঞ্চয়ের কথা

পূর্বে বর্ণিত। যদি এর সাথে বাঁধের ১০০ কিমি ভাটিতে একটি ব্যারেজ যোগ হয়, তাহলে বাঁধের ভাটিতে নদীক্ষয়ের পর ব্যারেজের উজানে আবার পলি সঞ্চিত হবে। সুতরাং, ব্যারেজের গেইট দিয়ে আবারও অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ পলি বিশিষ্ট পানি বের হবে যা আবারও ভাটিতে নদীক্ষয় ও পরবর্তীতে সেই পলি সঞ্চয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। শুধু বাঁধ হলে হয়তো ১০০-১৫০ কিমি এর মধ্যে নদীক্ষয় এর প্রভাব থাকতো, কিন্তু বাঁধের ১০০ কিমি ভাটিতে ব্যারেজ হলে নদীক্ষয়ের প্রভাব বাংলাদেশেও পরিলক্ষিত হবে।

টিপাইমুখ প্রকল্পের ইতিবাচক বনাম নেতিবাচক দিক

এ পর্বে টিপাইমুখ প্রকল্পের বিভিন্ন প্রভাব আলোচিত হয়েছে। চেষ্টা রয়েছে মূল সমস্যাগুলোকে সহজবোধ্য ভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে, যেন একজন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন, এ প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য কতটুকু কুফল বা সুফল বয়ে আনতে পারে। পানিসম্পদ কৌশলের একজন ছাত্র ও গবেষক হিসেবে যতটুকু ধারণা করা সম্ভব তা হচ্ছে, এই প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য ভাল কিছু বয়ে আনবেনা, যা আনবে তা হলো ভবিষ্যতের জন্য ভয়াবহ কিছু সমস্যা যা আলোচনায় দেখানো হয়েছে। এছাড়াও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই অঞ্চলের জন্য ইতিমধ্যে গৃহীত অথবা পরিকল্পনাধীন বাংলাদেশের বেশ কিছু পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইতিবাচক বনাম নেতিবাচক দ্বৈরথের যবনিকা টানতে পারে যৌথ গবেষণা। তবে তার আগে আমাদের পরস্পরের প্রতি সমব্যথী হতে হবে। কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পে কয়েকশো মেগাওয়াট বিদ্যুতের বিনিময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অযুত পাহাড়ি-বাঙালি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি আমাদের পাহাড়ে কতটুকু শান্তির পরশ বুলাচ্ছে সেটা বিতর্কের অবকাশ রাখে, কিন্তু আজকে ভারত যদি টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তাহলে এই দুই

দেশের মধ্যে তা যে শুধু অশান্তিই বয়ে নিয়ে আসবে তা নিশ্চিত করে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়।

www.prakashayatan.com

৬ এই মুহূর্তে আমাদের করণীয়

টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে পূর্ববর্তী আলোচনায় মূলত বাংলাদেশে এই বাঁধের সম্ভাব্য প্রভাবের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে এটি নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে এই বাঁধ ও প্রস্তাবিত ফুলেরতল ব্যারেজের ফলে বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে এক ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। সেই আলোকে এই মূহুর্তে আমাদের করণীয়গুলো এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য।

যাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

টিপাইমুখ বাঁধ একটি জাতীয় সমস্যা যার সাথে জড়িয়ে আছে আন্তর্জাতিক কিছু ইস্যু। সমস্যাটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় হওয়ায় সাবধানতা ও দক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা হওয়া জরুরী। আবেগের স্ফূরণ ও রাজনৈতিক প্রণোদনার ঊর্ধ্বে উঠে তথ্য ও গবেষণার প্রয়োগ এক্ষেত্রে অবশ্যকর্তব্য।

এই সমস্যাটির সুসমাপ্তির জন্য যাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের মধ্যে আছেনঃ

- সরকার,
- বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানী,
- রাজনীতিক,

- গণমাধ্যম,
- প্রভাবিত এলাকার বিভিন্ন পেশার জনগণ, এবং
- দেশের সাধারণ জনগণ।

বিষয়টি দু'টি দেশের মধ্যে আলোচ্য, তাই কূটনৈতিক পর্যায় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত। সমস্যাটির প্রকৌশলগত দিক বিবেচনার জন্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের মতামত নেওয়া জরুরী। সরকার এই কাজটি সঠিকমত করছে কিনা তার গঠনমূলক তদারকি করতে পারেন রাজনীতিকেরা। জনগণকে এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পার গণমাধ্যমগুলো। সবশেষে, সচেতন জনগণ দেশের প্রয়োজনে যেকোনো প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারকে সাহায্য করতে পারেন।

সরকারের সাম্প্রতিক ভূমিকা

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হওয়ায় টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এই গুরুদায়িত্ব শুধু সরকারই নিতে পারে। ইতোমধ্যে সংসদীয় কমিটি ভারত সফর করেছেন। এই কমিটিতে সরকারের সাংসদ, আমলা, ও বিশেষজ্ঞরা ছিলেন। তাঁদের সাথে বিশদ কী আলোচনা হয়েছে সেটি সাধারণ মানুষদের জানার অধিকার আছে। যতটুকু সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেছে, তার কিছুটা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

সংসদীয় কমিটি সম্প্রতি ভারত সফরের সময় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন,

টিপাইমুখ বাঁধটি যদি সেচ প্রকল্প হয় তাহলে তা অবশ্যই ক্ষতিকর হবে, এর বিরোধিতা জাতীয়ভাবে করা উচিত। কিন্তু বিদ্যুৎ প্রকল্প হলে আরও সমীক্ষা চালিয়ে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ৩০, ২০০৯

পরবর্তীতে এই সফর শেষে ফিরে এসে তিনি আবার বিবৃতি দিলেন,

We are convinced by India's assurance that they won't do anything that harms the interests of Bangladesh.

The Daily Star, August 05, 2009

অর্থাৎ আমাদের সংসদীয় প্রতিনিধিদল এই মর্মে নিশ্চিত যে ভারত বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু করবে না। সংসদীয় দলের মাননীয় সদস্যের কাছে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে প্রশ্ন আসতে পারে,

- এক্ষেত্রে "harm" বা "ক্ষতি"-র প্রকৃত সংজ্ঞা কী?
- বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু না করার ব্যাপারে ভারতের আশ্বাস যদি আন্তরিক হয়, তবে এই নিশ্চয়তা কি আছে যে বাংলাদেশ টিপাইমুখ প্রকল্পের একটিও ক্ষতিকর দিক ভারতের কাছে তুলে ধরতে পারলে ভারত এই প্রকল্প বন্ধ করে দেবে?

তিনি এরপর আরও বলেছেন,

They said they have conducted environmental impact

assessment, and will do more. India will be the first to be affected, if any.

The Daily Star, August 05, 2009

অর্থাৎ, “তারা বলেছে (ভারত) যে তারা এই প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব খতিয়ে দেখেছে এবং ভবিষ্যতে আরো দেখবে। ভারতই এই ক্ষেত্রে বেশী প্রভাবিত হবে।” কিন্তু উপরের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে ভারতের এই EIA রিপোর্টে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে।

একই খবরে ঐ দলের সদস্য এ বি এম রুহুল আমীন বললেন,

The project is just at its initial state. I don’t think it could be implemented in my lifetime.

The Daily Star, August 05, 2009

অর্থাৎ, “এই প্রকল্প এখনো প্রক্রিয়াধীন আছে। আমি মনে করিনা যে আমার জীবদ্দশায় এটি বাস্তবায়িত হবে।” যথাযথ তথ্য ও গবেষণা ছাড়া এ-ধরনের বিবৃতি অবিবেচনাপ্রসূত। এটি সমস্যা সম্পর্কে কোনোরূপ ধারণা ছাড়াই সমাধানে পৌঁছানোর মতো মন্তব্য।

দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত পূর্বোক্ত খবরে প্রকাশ, এই সংসদীয় কমিটি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিদ্যুৎমন্ত্রীর সাথে দেখা করে “ফুলেরতল ব্যারেজ না নির্মাণের” আশ্বাসকে তাঁদের সবচেয়ে বড় সফলতা মনে করছে, অথচ আমরা এর অনেক আগে থেকেই ভারতের কাছ থেকে এই ধরনের আশ্বাস শুনে আসছি।

দশ সদস্যের এই সংসদীয় দলে পানিবিশেষজ্ঞ হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মনোয়ার হোসেন। সবচেয়ে অবাক বিষয় হচ্ছে এখনও পর্যন্ত এই সফর সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে ডঃ হোসেনের বিবৃতি না আসা। তবে এই সফরের

পূর্বে এক সাক্ষাৎকারে তিনি কয়েকটি মন্তব্য করেছেন যা এই প্রসঙ্গে সমীচীন নয়,

"যেহেতু জলাধারে পানি সংরক্ষণ করা হবে তাই এর কিছু প্রভাব ভাটিতে পড়বে। তবে সেই প্রভাব টিপাইমুখ পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের সারপ্লাস বিদ্যুৎ বাংলাদেশ ব্যবহারের মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সাপ্তাহিক ২০০০, ১২ জুন ২০০৯

এখানে বাড়তি বিদ্যুতের প্রসঙ্গ কোথা থেকে এলো, আর এলেও তা বাংলাদেশে বিতরণ বা ব্যবহারের প্রসঙ্গের অবতারণা হলো কীভাবে, তা বোধগম্য নয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভারত এই বিষয়ে কখনও কোনো বিবৃতি দেয়নি। সেক্ষেত্রে আগ বাড়িয়ে এই মন্তব্য করা প্রকারান্তরে টিপাইমুখ বাঁধের বাস্তবায়নকে মেনে নেয়ার শামিল।

এই সফরের আরও যে-বিষয়টি পরিষ্কার নয় তা হলো, নিপোকোর টিপাইমুখ প্রকল্পের পরিবেশগত রিপোর্টে ভাটি অঞ্চল (বাংলাদেশ) উপেক্ষিত থাকার ব্যাপারে ভারতকে কেন প্রশ্ন করা হলো না। একটি বাঁধের ভাটি অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, অথচ এর কোনো কিছুই সংসদীয় কমিটি উল্লেখ করেনি।

ভারতের সাম্প্রতিক ভূমিকা

টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে কোনো বিতর্কের সূচনা হলেই ভারত কেবল ফুলেরতল ব্যারেজ না করার আশ্বাস দিচ্ছে, একটি বারও শুধু বাঁধের জন্য বাংলাদেশের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে কোনো কিছু বলছেনা। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি নিপকোর টিপাইমুখ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবের গবেষণায় বাংলাদেশ কীভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। বাঁধ নির্মাণের সময় ভারতের ভাটি অঞ্চল উপেক্ষা করার এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে নেতিবাচক।

সংসদীয় প্রতিনিধিদল ভারত সফরের সময় ভারতের কাছ থেকে কিছু ইতিবাচক বিষয় বের হয়ে এসেছে।

- বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের ব্যাপারে ভারতের কাছ থেকে তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তির আশ্বাস পাওয়া গেছে, তবে তা "বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের" প্রয়োজন অনুযায়ী। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে বাংলাদেশ কী কী উপাত্তের জন্য অনুরোধ পাঠাবে।

- যৌথ নদী কমিশনের সদস্য ও ভারতের সাবেক সদস্য বি জি ভার্গিস বলেছেন যে টিপাইমুখ বাঁধের কারণে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের হাওড় এলাকার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে এই মর্মে বাঁধের বিরোধিতা করতে হলে বাংলাদেশকে তা পর্যাপ্ত গবেষণা করে তুলে ধরতে হবে [১৫]। প্রশ্ন হচ্ছে, এটি কি ভারতের আনুষ্ঠানিক মন্তব্য? যদি তা-ই হয়, তবে বাংলাদেশ সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। পর্যাপ্ত গবেষণা করে একথা প্রমাণ করা সম্ভব টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের কতটা ক্ষতি করবে।

সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপাত্ত অপরপক্ষের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার চেয়ে সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার বা ডেটাবেজ গড়ে তোলা অনেক সুবিধাজনক। এক্ষেত্রে দুই পক্ষই একই ধরনের উপাত্ত থেকে তাদের বিশ্লেষণ ও ফলাফল পাবে, তাতে অধিকাংশে মিল থাকবে। এর ভিত্তিতে অনেক অনাহূত বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হবে।

এই তথ্যভাণ্ডার গড়ে না তুলে "প্রয়োজন অনুযায়ী" উপাত্তের আদান-প্রদান করে এ-ধরনের গবেষণায় কোনো নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া সম্ভব না। আদান-প্রদানের দীর্ঘসূত্রিতার দরুণ বিশ্লেষণ সমসাময়িক থাকবে না। সাম্প্রতিকতম উপাত্তের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে দুই দেশের মধ্যে একটি সাধারণ ও উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডার থাকে প্রয়োজন। একে নিয়মিত রাখা গেলে তা সকল পক্ষের জন্যই উপকারী।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, একই ধরনের বিশ্লেষণে বিভিন্ন ধ্রনের ফলাফল। এই ফলাফল ইনপুট ডেটাবেজের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেহেতু নির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য কোনো ডেটাবেজ কারও কাছেই নেই, সেহেতু কিছু আদর্শ অবস্থা ধরে যাবতীয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ধারণার ভিত্তিতে তৈরি এধরনের বিশ্লেষণে সামান্য তারতম্যের কারণেই ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

গবেষণায় এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে দুই দেশের মধ্যে উন্মুক্ত ও সমন্বিত ডেটাবেজ তৈরি খুব জরুরী। উন্নত বিশ্বে এধরনের ডেটাবেজ তৈরি করার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। যেকোন প্রতিষ্ঠান বা গবেষক নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে সংরক্ষিত উপাত্ত ব্যবহার করতে পারেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা গবেষণার অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সফটওয়্যার ভারত ও বাংলাদেশের কারো নেই। নদীবিষয়ক তথ্য উন্মুক্ত থাকলে তা প্রবাসে অধ্যয়নরত

গবেষকরা ব্যবহার করে টিপাইমুখ ও অন্যান্য জলাধারের ব্যাপারে নির্ভুল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে রাজনীতিকদের অবদান অনস্বীকার্য। তবে তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনেক গুণে উন্নত হতে পারে গবেষক, প্রকৌশলী, ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায়। এঁদের কাজ বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কোনো সমস্যার বেশ কিছু সম্ভাব্য সমাধান তৈরি করে দেওয়া। রাজনীতিকরা তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই সমাধানমালা থেকেই এক বা একাধিক পথ বেছে নেবেন। এই পন্থায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সাধারণত দেশের জন্য উপকারী এবং বিতর্কমুক্ত হয়ে থাকে।

টিপাইমুখ বাঁধের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডার অত্যন্ত আবশ্যিক একটি বিষয়, যা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বয়ে চলা নদীর বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কী করণীয়

এই মূহুর্তে বাংলাদেশের পর্যায়ক্রমে করণীয়গুলো নিম্নরূপ।

- সংসদীয় দলের ভারত সফরের মধ্য দিয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। ভারত বলেছে আমাদের কী কী উপাত্ত লাগবে তা জানাতে। সরকারের এই মূহুর্তে উচিত টিপাইমুখ নিয়ে একটি সমন্বিত বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা। এই বিশেষজ্ঞ দলে যেসব অনুষদ থেকে লোক থাকতে পারেন, সেগুলি হলোঃ

    - পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ
    - প্রকৌশল ভূতত্ত্ববিদ
    - পরিবেশবিদ
    - বাস্তুতন্ত্রবিদ (উদ্ভিজ ও প্রাণিজ)

www.prakashayatan.com

- o প্রাণীবিশেষজ্ঞ
- o কৃষিবিদ
- o নৃবিজ্ঞানী
- o অর্থনীতিবিদ
- o আইনবিদ

কারা এই দলে থাকবেন সেটি নির্ণয়ের দায়িত্ব সরকারের, তবে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁদেরকেই রাখতে হবে যাঁদের স্ব স্ব বিষয়ে বিস্তর গবেষণা আছে। সেই সাথে এ-জাতীয় ইস্যু নিয়ে অতীতে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো উচিত।

- সমন্বিত বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে দু'টি বিষয়ে প্রস্তাব পাঠাতে পারে।

  - o বাংলাদেশের গবেষণা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারত টিপাইমুখ প্রকল্পের কোন কাজ শুরু করবে না।
  - o ভারত বাংলাদেশকে বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শ অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপাত্ত প্রদান করবে।

- সকল উপাত্ত যোগাড় হওয়ার পর টিপাইমুখ বাঁধের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে গবেষণায় নিম্নোক্ত দিকগুলো খতিয়ে দেখা উচিত।

  - o বাঁধ ও ব্যারেজের কারণে প্রবাহের কী পরিবর্তন হবে,

- o এই প্রবাহ হ্রাস ও জলাধারে পলিহ্রাসের প্রভাবে বাঁধের ভাটিতে ব্যাপক নদীক্ষয়ের কীরূপ প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে,
- o প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে সিলেট ও মৌলভীবাজার অঞ্চলের হাওড়গুলির বাস্তুতন্ত্রে কী পরিবর্তন আসবে, এবং
- o এই এলাকার সাথে জড়িত মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর বাঁধের কী প্রভাব পড়বে।

বস্তুত, এই সবকিছু নিয়ে সমীক্ষার পরই জানা যাবে এই বাঁধ নির্মিত হলে বাংলাদেশের কী পরিমাণ ক্ষতি হবে। এই পর্যায়ে বাঁধের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে আনা আদৌ সম্ভব হবে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে যৌথ গবেষণার প্রস্তাব আসতে পারে।

- গবেষণালব্ধ ফলাফল বাংলাদেশ বা ভারতে সরকার পর্যায়ের বৈঠকে পরিবেশন করা প্রয়োজন। বাঁধের সম্ভাব্য ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য এর ডিজাইনে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সম্ভব থাকলে তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

- বিশেষজ্ঞ দল যদি মনে করেন বাঁধের ক্ষতি সহনীয় মাত্রায় আনা সম্ভব নয়, তাহলে বাংলাদেশের কাছ থাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন না করার প্রস্তাব ভারতের কাছে উত্থাপন করতে হবে।

- প্রকল্প বন্ধ করার পক্ষে বাংলাদেশের প্রস্তাব কূটনৈতিক ভাবে ভারত প্রত্যাখ্যান করলে জাতিসংঘের মাধ্যমে আইনগতভাবে কীভাবে আমরা প্রচেষ্টা চালাতে পারি তার

খসড়া প্রণয়ন করতে হবে। বিশেষজ্ঞ দলের আইনবিদেরা এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন।

- প্রয়োজনে ভারতের বিরুদ্ধে আইনগত ভাবে এই সমস্যা মোকাবেলা করার সময় দেশের রাজনীতিক, সংবাদ মাধ্যম, সাধারণ জনগণকে দেশের প্রেক্ষাপটে এক থাকতে হবে। জাতিগত ভাবে আমাদের সমস্যাগুলো আমরা অনেক ক্ষেত্রেই না বুঝে বা ভবিষ্যৎ আঁচ না করে সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন বিবৃতি দিয়ে থাকি যা দেশের জন্য ভাল কিছু বয়ে আনেনা।

আইনগত কী কী দিক বাংলাদেশের হাতে আছে

টিপাইমুখ প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হবার পরও ভারত যদি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চায়, সেক্ষেত্রে আমাদের আইনগত ভাবে কী করার আছে সে-বিষয়েও জানা প্রয়োজন। এই বিষয়ে সবচেয়ে ভাল লিখেছেন ডঃ আসিফ নজরুল [৫]। এর আলোকে কিছু তথ্য দেওয়া হলোঃ

- ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের সংবিধির ৩৮ ধারা অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক যেকোনো চুক্তি আন্তর্জাতিক আইনের উৎস। এই বিচারে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙ্গা চুক্তি একটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের চুক্তি [১৬], এবং এই দুই দেশের জন্য একটি আন্তর্জাতিক আইন যা ২০২৬ সাল পর্যন্ত মেনে চলতে দুই দেশই বাধ্য।

- গঙ্গাচুক্তির অনুচ্ছেদ ৯-এ আছে,

পক্ষপাত বিহীন ও সাম্যতা প্রসূত এবং কোনো পক্ষেরই ক্ষতি না করে দুই সরকারই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বহমান অন্যান্য আন্তসীমান্ত নদীসমুহের চুক্তির ব্যাপারে একক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ব্যাপারে একমত।

অতএব, এই চুক্তি অনুযায়ী আমরা গঙ্গা ছাড়াও অন্য আন্তঃসীমান্ত নদী যেমন বরাক নদীর ক্ষেত্রে "সাম্যতা" ও "কোনো পক্ষেরই ক্ষতি" এই দু'টি ধারার ভিত্তিতে আইনের আশ্রয় নিতে পারি। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ দল যদি প্রমাণ করতে পারেন টিপাইমুখ বাঁধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষতি হচ্ছে ও সাম্যতা বিনষ্ট হচ্ছে, তাহলে তারপরেও টিপাইমুখ বাঁধ করতে গেলে তা গঙ্গাচুক্তি ভঙ্গের কারণ হবে যা ভারত ২০২৬ সালের আগে পারে না।

- প্রশ্ন উঠতে পারে, ২০২৬ সালের পরে কী হবে? সেটির জন্য গঙ্গা চুক্তির অনুচ্ছেদ ১২ লক্ষ্যনীয়,

দুই পক্ষের স্বাক্ষরের ভিত্তিতে এই চুক্তি বাধ্যবাধকতায় যাবে ও তা বলবৎ থাকবে ত্রিশ বছর পর্যন্ত, এবং পারস্পরিক প্রচেষ্টায় তা নবায়ন যোগ্য।

অতএব, দুই দেশের চেষ্টা ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে নবায়নের বিষয়টিও চুক্তির মধ্যেই আছে।

www.prakashayatan.com

৭ পরিশিষ্ট

ভারত টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়নের দু'টি মূল প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছে -- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আরও বিকল্প প্রযুক্তি ভারতের কাছেই আছে। উদাহরণ স্বরূপ 'Indo-US Nuclear Agreement'-এর কথা বলা যেতে পারে [১]। যখন খোদ ভারতেই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ চলছে, তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মরিয়া হয়ে এই প্রকল্প হাতে নেয়ার সিদ্ধান্ত প্রশ্নবিদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

বন্যা নিয়ন্ত্রনের প্রসঙ্গটিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নমুক্ত নয়। সাম্প্রতিক কালে 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ' কথাটি ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে, তার পরিবর্তে অবতারণা ঘটছে 'বন্যা ব্যবস্থাপনা' ধারণার। সেই আলোকে এটি এখন প্রমাণিত যে বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য 'স্ট্রাকচারাল' বা ভৌত পদ্ধতির চেয়ে 'নন-স্ট্রাকচারাল' পদ্ধতি অধিক পরিবেশ-বান্ধব এবং তা ভবিষ্যতের জন্য ভাল।

এই বাস্তবতা বিবেচনায়, ভারত চাইলে টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পের বাস্তবায়ন না করেও তার সমস্যাবলি সমাধান করতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি বিতর্কিত প্রকল্প হাতে নিয়ে দু'টি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে অবিশ্বাস ও শত্রুতা বাড়তে দেওয়া অবিবেচনাপ্রসূত।

ফারাক্কা বাঁধের বয়ে আনা দুঃস্বপ্নের কারণে টিপাইমুখ বাঁধ একটি স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংলাপ ও সমঝোতার ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজন যথাযথ প্রস্তুতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ।

অবিমৃশ্য সিদ্ধান্তগ্রহণের ফলে ঝুঁকির মুখে পতিত হতে পারে বাংলাদেশের কৃষ্টি ও অস্তিত্ব। এ-কারণেই উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় বা নাশকতা নয়, বরং নিজেদের মনন, প্রজ্ঞা, আর গবেষণা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে টিপাইমুখ প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য কতটা ভয়াবহ ভবিষ্যৎ বয়ে আনতে পারে। সরকারের কাছ থেকে এই অবস্থায় দৃঢ়চিত্ত কূটনীতি ও বিচক্ষণতার প্রত্যাশা সমগ্র জাতির। দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা অগণিত বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর সহায়তায় সরকার খুব সহজেই নিতে পারে সঠিক সিদ্ধান্ত।

শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রকল্পের ব্যাপারে সচেতনতা নয়, এই সুযোগে পুরো দেশকে সচেতন করতে হবে প্রকৃতি, পরিবেশ, ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। এই প্রকল্পের বিশ্লেষণ সেই জ্ঞান অর্জনেরই পথে একটি পদক্ষেপ হোক, আগামী প্রজন্মের জন্য থাকুক একটি সুন্দর বাংলাদেশ।

www.prakashayatan.com

তথ্যসূত্র

[১] উইকিপিডিয়া

[২] Environment Impact Assessment (EIA) of Tipaimukh HE(M) Project, submitted for North Eastern Electric Power Corporation Limited (NEEPCO), neepco.gov.in/env.html

[৩] ডঃ জহির উদ্দিন চৌধুরী, ১২ জুলাই ২০০৯, 'বরাক নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করা হলে তা হবে বিপদ জনক', প্রথম আলোকে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকার।

[৪] ডঃ আইনুন নিশাত, ২৮ জুন ২০০৯, 'দুই দেশেই টিপাইমুখ বাঁধের পরিবেশগত প্রভাবের জরিপ চালাতে হবে', প্রথম আলোকে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকার।

[৫] ডঃ আসিফ নজরুল, ৫ জুলাই ২০০৯, 'পিনাক রঞ্জনের ছোট ভুল, আমাদের বড় ভুল', প্রথম আলো।

[৬] এম এ কাসেম, ৬ জুলাই ২০০৯, 'টিপাইমুখঃ যে কথা কেউ বলছে না', প্রথম আলো।

[৭] ডঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ১৬ জুলাই ২০০৯, 'টিপাইমুখ বাঁধঃ কিছু শর্ত মানলে কম ক্ষতিকর হতে পারে', প্রথম আলো।

[৮] Dr.Sara Bennett, Mujib Huq and Dr. David Mclean,1994, 'Initial Environmental Evaluation, Appendix to the Northeast RegionalWater Management Plan, Bangladesh Flood Action Plan 6 (IEE NERP FAP 6)',Final Version।
http://bicn.com/wei/resources/nerp/iee/index.htm

[৯] M A Matin, 7 February 2006, 'Another Farakka ? No, Tipaimukh Dam is different', The Daily Star.

[১০] The Ecology of Dams
http://chamisa.freeshell.org/dam.htm

[১১] মোঃ গোলাম্ কিবরিয়া " ISSUE-GAINING PUBLIC ACCEPTANCE FOR LARGE DAMS ON INTERNATIONAL RIVERS: THE CASE OF TIPAIMUKH DAM IN INDIA AND CONCERNS IN LOWER RIPARIAN", সেপ্টেম্বর ২০০৫, United Nations Environment Programme (UNEP) কতৃক আয়োজিত Dams and Development Project শীর্ষক কর্মশালা, নাইরবি, কেনিয়া।
http://hqweb.unep.org/dams/files/Issue-basedWorkshops/GPA_Proceedings.pdf

[১২] Dogra, B. 1992. The Debate on Large Dams. Centre for Science and Environment, New Delhi.

[১৩] R.K. Ranjan Singh, 'Tipaimukh' in The Ecologist Asia, Vol. 11 No. 1 January-March 2003

[১৪] প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০০৯

[১৫] প্রথম আলো, ৫ অগাস্ট ২০০৯

[১৬] Vienna Convention on the Law of Treaties 1969
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf

[১৭] Dam design and operation to optimize fish production in impounded river basins

জাহিদুল ইসলাম

জন্ম ১৯৭৯ সালে টাঙ্গাইলে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পানিসম্পদকৌশল থেকে বিএসসি ও এমএসসি সম্পন্ন করেছেন।

কর্মজীবন শুরু বুয়েটের পানিসম্পদ কৌশল বিভাগে শিক্ষকতা দিয়ে। নেদারল্যান্ডস সরকারের গবেষণা ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন ডেলফট হাইড্রোলিকসের গবেষকদের সাথে।

পানিসম্পদ কৌশলে পিএইচডি গবেষণার জন্য এখন অবস্থান করছেন কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল ও গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন আলবার্টা প্রভিন্সের সম্মানসূচক *আলবার্টা ইনজেনুইটি পিএইচডি স্কলারশীপ*।

পানিসম্পদ ও সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করেন জনপ্রিয় অনলাইন লেখক সমাবেশ **সচলায়তনে**।

যোগাযোগের মাধ্যমঃ
ইমেইলঃ zahidripon@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.ualberta.ca/~mdzahidu